সুকুমার রায়

পাগলা দাশু

পাগলা দাশু

সুকুমার রায়

সুকুমার রায়

পাগলা দাশু

প্রথম প্রকাশ :১৯৪০

সুকুমার রায়

(৩০ অক্টোবর ১৮৮৭ - ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩)

মৃত্যুর ১৭ বছর পর, ১৯৪০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় সুকুমার রায়ের গল্প সংকলন ‘পাগলা দাশু’। এটিই সুকুমার রায়ের প্রথম গল্প সংকলন। ‘পাগলা দাশু’-এর গল্পগুলো সুকুমার রায়ের জীবদ্দশায়, তাঁর সম্পাদিত ‘সন্দেশ’-এ প্রকাশিত হয়েছিলো। ‘পাগলা দাশু’-এর প্রকাশক ছিলেন এম. সি. সরকার। সেই সংকলনের ভূমিকা লিখেছিলেন ময়মনসিংহের রায়চৌধুরীদের বন্ধু পরিবার জোড়াসাঁকো’র ঠাকুরদের একজন–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তিনি লিখেছিলেন, “সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে, তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি, তাঁর ভাব-সমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল, সেই জন্যেই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে ব্যঙ্গরসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা গিয়েছে। কিন্তু সুকুমারের অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে, তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না।”

সূচীপত্র

১. পাগলা দাশু

২. দাশুর খ্যাপামি

৩. চীনে পটকা

৪. দাশুর কীর্তি

৫. চালিয়াৎ

৬. সবজান্তা

৭. ভোলানাথের সর্দারি

৮. আশ্চর্য কবিতা

৯. নন্দলালের মন্দ কপাল

১০. নতুন পণ্ডিত

১১. সবজান্তা দাদা

১২. যতীনের জুতো

১৩. ডিটেকটিভ

১৪. ব্যোমকেশের মাঞ্জা

১৫. জগ্যিদাসের মামা

১৬. আজব সাজা

১৭. কালাচাঁদের ছবি

১৮. গোপালের পড়া

১৯. পেটুক

২০. ভুল গল্প

আমাদের স্কুলের যত ছাত্র তাহার মধ্যে এমন কেহই ছিল না, যে পাগলা দাশুকে না চিনে। যে লোক আর কাহাকেও জানে না, সেও সকলের আগে পাগলা দাশুকে চিনিয়া লয়। সেবার একজন নূতন দারোয়ান আসিল, একেবারে আনকোরা পাড়াগেঁয়ে লোক, কিন্তু প্রথম যখন সে পাগলা দাশুর নাম শুনিল, তখনই সে আন্দাজে ঠিক ধরিয়া লইল যে, এই ব্যক্তিই পাগলা দাশু। কারণ তার মুখের চেহারায়, কথাবার্তায়, চলনে চালনে বোঝা যাইত যে তাহার মাথায় একটু 'ছিট' আছে। তাহার চোখদুটি গোল-গোল, কানদুটা অনাবশ্যক রকমের বড়, মাথায় এক বস্তা ঝাঁকড়া চুল। চেহারাটা দেখিলেই মনে হয়—

ক্ষীণদেহ খর্বকায় মুণ্ড তাহে ভারি
যশোরের কই যেন নরমূর্তিধারি।

সে যখন তাড়াতাড়ি চলে অথবা ব্যস্ত হইয়া কথা বলে, তখন তাহার হাত-পা ছোঁড়ার ভঙ্গি দেখিয়া হঠাৎ চিংড়িমাছের কথা মনে পড়ে।

সে যে বোকা ছিল তাহা নয়। অঙ্ক কষিবার সময়, বিশেষত লম্বা-লম্বা গুণ-ভাগের বেলায় তার আশ্চর্য মাথা খুলিত। আবার এক-এক সময় সে আমাদের বোকা বানাইয়া তামাশা দেখিবার জন্য এমন সকল ফন্দি বাহির করিত, যে আমরা তাহার বুদ্ধি দেখিয়া অবাক হইয়া থাকিতাম।

দাশু, অর্থাৎ দাশরথি, যখন প্রথম আমাদের স্কুলে ভর্তি হয়, তখন জগবন্ধুকে আমাদের ক্লাশের 'ভালো ছেলে' বলিয়া সকলে জানিত। সে পড়াশুনায় ভালো হইলেও, তাহার মতো অমন একটি হিংসুটে ভিজেবেড়াল আমরা আর দেখি নাই। দাশু একদিন জগবন্ধুর কাছে কি একটা ইংরাজি পড়া জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল। জগবন্ধু পড়া বলিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাকে বেশ দু'কথা শোনাইয়া বলিল, "আমার বুঝি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই? আজ এঁকে ইংরিজি বোঝাব, কাল ওঁর অঙ্ক কষে দেব, পরশু আরেকজন

আসবেন আরেক ফরমাইস নিয়ে— ঐ করি আর কি!" দাশু সাংঘাতিক চটিয়া বলিল, "তুমি তো ভারি চ্যাঁচড়া ছোটোলোক হে!" জগবন্ধু পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে নালিশ করিল, "ঐ নতুন ছেলেটা আমাকে গালাগালি দিচ্ছে।" পণ্ডিতমহাশয় দাশুকে এমনি দু-চার ধমক দিয়া দিলেন যে, সে বেচারা একেবারে দমিয়া গেল।

আমাদের ইংরাজি পড়াইতেন বিষ্টুবাবু। জগবন্ধুর তাঁহার প্রিয় ছাত্র। পড়াইতে পড়াইতে যখনই তাঁহার বই দরকার হয়, তিনি জগবন্ধুর কাছেই বই চাহিয়া লন। একদিন তিনি পড়াইবার সময় 'গ্রামার' চাহিলেন, জগবন্ধু তাড়াতাড়ি তাহার সবুজ কাপড়ের মলাট দেওয়া 'গ্রামার'খানা বাহির করিয়া দিল। মাস্টার মহাশয় বইখানি খুলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বইখানা কার?" জগবন্ধু বুক ফুলাইয়া বলিল, "আমার।" পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, "হুঁ—নূতন সংস্করণ বুঝি? বইকে-বই একেবারে বদলে গেছে।" এই বলিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন—"যশোবন্ত দারোগা—লোমহর্ষক ডিটেক্‌টিভ নাটক।" জগবন্ধু ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া বোকার মতো তাকাইয়া রহিল। মাস্টার মহাশয় বিকটরকম চোখ পাকাইয়া বলিলেন, "এই সব জ্যাঠামি বিদ্যে শিখছ বুঝি?" জগবন্ধু আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মাস্টার মহাশয় এক ধমক দিয়া বলিলেন, "থাক, থাক, আর ভালোমানুষি দেখিয়ে কাজ নেই—ঢের হয়েছে।" লজ্জায়, অপমানে জগবন্ধুর দুই কান লাল হৈয়া উঠিল—আমরা সকলেই তাহাতে বেশ খুশি হইলাম। পরে জানা গেল যে, এটি দাশু ভায়ার কীর্তি, সে মজা দেখিবার জন্য 'গ্রামার'-এর জায়গায় ঠিক ঐরূপ মলাট দেওয়া একখানা বই রাখিয়া দিয়াছিল।

দাশুকে লইয়া আমরা সর্বদাই ঠাট্টা-তামাশা করিতাম এবং তাহার সামনেই তাহার বুদ্ধি ও চেহারা সম্বন্ধে অনেক অপ্রীতিকর সমালোচনা করিতাম। তাহাতে একদিনও তাহাকে বিরক্ত হইতে দেখি নাই। এক এক সময়ে সে নিজেই আমাদের মন্তব্যের উপর রঙ চড়াইয়া নিজের সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত গল্প বলিত! একদিন সে বলিল, "ভাই, আমাদের পাড়ায় যখনই কেউ আমসত্ত্ব বানায় তখনই আমার ডাক পড়ে। কেন জানিস?"

আমরা বলিলাম, "খুব আমসত্ত্ব খাস বুঝি?" সে বলিল, "তা নয়। যখন আমসত্ত্ব শুকোতে দেয় আমি সেইখানে ছাদের ওপর বার দুয়েক এই চেহারাখানা দেখিয়ে আসি। তাতেই পাড়ার ত্রিসীমানার মধ্যে যত কাক সব 'ত্রাহি ত্রাহি' করে ছুটে পালায়। কাজেই আর আমসত্ত্ব পাহারা দিতে হয় না।"

একবার সে হঠাৎ পেণ্টেলুন পরিয়া স্কুলে হাজির হইল। ঢলঢলে পায়জামার মতো পেণ্টেলুন আর তাকিয়ার খোলের মতো কোট পরিয়া তাহাকে যে কিরূপ অদ্ভুত দেখাইতেছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতেছিল এবং সেটা তাহার কাছে ভারি একটা আমোদের ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "পেণ্টেলুন পরেছিস কেন?" দাশু একগাল হাসিয়া বলিল, "ভালো করে ইংরাজি শিখব ব'লে।" আরেকবার সে খামখা নেড়া মাথায় এক পট্টি বাঁধিয়া ক্লাশে আসিতে আরম্ভ করিল এবং আমরা সকলে তাহা লইয়া ঠাট্টা-তামাশা করায় যারপরনাই খুশি হইয়া উঠিল। দাশু আদপেই গান গাহিতে পারে না। তাহার যে তালজ্ঞান বা সুরজ্ঞান একেবারেই নেই, এ কথা সে বেশ জানে। তবু সেবার ইনস্পেক্টর সাহেব যখন স্কুল দেখিতে আসেন, তখন আমাদের খুশি করিবার জন্য সে চীৎকার করিয়া গান শুনাইয়াছিল। আমরা কেহ ওরূপ করিলে সেদিন রীতিমতো শাস্তি পাইতাম। কিন্তু দাশু 'পাগলা' বলিয়া তাহার কোন শাস্তি হইলো না।

একবার ছুটির পরে দাশু অদ্ভুত এক বাক্স বগলে লইয়া ক্লাশে হাজির হইল। মাস্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে দাশু, ও বাক্সের মধ্যে কি এনেছ?" দাশু বলিল, "আজ্ঞে, আমার জিনিসপত্র।" 'জিনিসপত্র'টা কিরূপ হইতে পারে, এই লইয়া আমাদের মধ্যে বেশ একটু তর্ক হইয়া গেল। দাশুর সঙ্গে বই, খাতা, পেনসিল, ছুরি, সবই তো আছে, তবে আবার জিনিসপত্র কি রে বাপু? দাশুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে সোজাসুজি কোনো উত্তর না দিয়া বাক্সটিকে আঁকড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "খবরদার, আমার বাক্স তোমরা কেউ ঘেঁটো না।" তাহার পর চাবি দিয়া বাক্সটাকে একটুখানি ফাঁক করিয়া, সে তাহার ভিতরে চাহিয়া কি যেন দেখিয়া লইল এবং 'ঠিক আছে' বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বিড়্‌বিড়্ করিয়া হিসাব করিতে লাগিল। আমি

একটুখানি দেখিবার জন্য উঁকি মারিতে গিয়াছিলাম—অমনি পাগলা মহা ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরাইয়া বাক্স বন্ধ করিয়া ফেলিল।

ক্রমে আমাদের মধ্যে তুমুল আলোচনা আরম্ভ হইল। কেহ বলিল, "ওটা ওর টিফিনের বাক্স—ওর মধ্যে খাবার আছে।" কিন্তু একদিনও টিফিনের সময় তাহাকে বাক্স খুলিয়া কিছু খাইতে দেখিলাম না। কেহ বলিল, "ওটা বোধ হয় ওর মনিব্যাগ—ওর মধ্যে টাকাপয়সা আছে, তাই ও সর্বদা কাছে কাছে রাখতে চায়।" আরেকজন বলিল, "টাকাপয়সার জন্য অত বড়ো বাক্স কেন? ও কি ইস্কুলে মহাজনী কারবার খুলবে নাকি?"

একদিন টিফিনের সময়ে দাশু হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বাক্সের চাবিটা আমার কাছে রাখিয়া গেল আর বলিল, "এটা এখন তোমার কাছে রাখ, দেখো হারায় না যেন। আর আমার আসতে যদি একটু দেরি হয়, তবে- তোমরা ক্লাশে যাবার আগে ওটা দারোয়ানের কাছে দিয়ে দিয়ো।" এই কথা বলিয়া সে বাক্সটা দারোয়ানের জিম্মায় রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন আমাদের উৎসাহ দেখে কে! এতদিনে সুবিধা পাওয়া গিয়াছে, এখন হতভাগা দারোয়ানটা একটু তফাৎ গেলেই হয়। খানিকবাদে দারোয়ান তাহার রুটি পাকাইবার লোহার উনানটি ধরাইয়া কতকগুলা বাসনপত্র লইয়া কলতলার দিকে গেল। আমরা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। দরোয়ান আড়াল হওয়া মাত্র আমরা পাঁচ-সাতজনে তাহার ঘরের কাছে সেই বাক্সের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলাম। তার পর আমি চাবি দিয়া বাক্স খুলিয়া দেখি, বাক্সের মধ্যে বেশ ভারী একটা কাগজের পোঁটলা নেকড়ার ফালি দিয়া খুব করিয়া জড়ানো। তার পর তাড়াতাড়ি পোঁটলার প্যাঁচ খুলিয়া দেখ গেল, তাহার মধ্যে একখানা কাগজের বাক্স—তার ভিতরে আরেকটি ছোট পোঁটলা। সেইটি খুলিয়া একখানা কার্ড বাহির হইল, তাহার একপিঠে লেখা 'কাঁচকলা খাও' আরেকটি পিঠে লেখা 'অতিরিক্ত কৌতূহল ভালো নয়'। দেখিয়া আমরা এ-উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। সকলের শেষে একজন বলিয়া উঠিল, "ছোকরা আচ্ছা যাহোক, আমাদের বেজায় ঠকিয়েছে।" আরেকজন বলিল, "যেমনভাবে বাঁধা ছিল, তেমনি করে রেখে দাও, সে যেন টের না পায় যে আমরা খুলেছিলাম। তা হলে সে নিজেই জব্দ হবে।" আমি বলিলাম, "বেশ

কথা, ও ছোকরা আসলে পরে তোমরা খুব ভালোমানুষের মতো বাক্সটা দেখাতে বোলো আর ওর মধ্যে কি আছে- সেটা বার করে জানতে চেয়ো।” তখন আমরা তাড়াতাড়ি কাগজপত্রগুলি বাঁধিয়া, আগেকার মতো পোঁটলা পাকাইয়া বাক্সে ভরিয়া ফেলিলাম।

বাক্সে চাবি দিতে যাইতেছি, এমন সময় হো হো করিয়া একটা হাসির শব্দ শুনা গেল- চাহিয়া দেখি পাঁচিলের উপর বসিয়া পাগলা দাশু হাসিয়া কুটিকুটি। হতভাগা এতক্ষণ চুপিচুপি তামাশা দেখিতেছিল। আর আমাদের কথাবার্তা সমস্ত শুনিতেছিল! তখন বুঝিলাম আমার কাছে চাবি দেওয়া, দারোয়ানের কাছে বাক্স রাখা, টিফিনের সময়ে বাইরে যাওয়ার ভান করা, এ সমস্ত তাহার শয়তানি। খামখা আমাদের আহাম্মক বানাইবার জন্যই, সে মিছামিছি এ কয়দিন ধরিয়া ক্রমাগত একটা বাক্স, বহিয়া বেড়াইয়াছে।

সাধে কি বলি পাগলা দাশু?

ইস্কুলের ছুটির দিন। ইস্কুলের পরেই ছাত্র-সমিতির অধিবেশন হবে, তাতে ছেলেরা মিলে অভিনয় করবে। দাশুর ভারি ইচ্ছে ছিল, সে-ও একটা কিছু অভিনয় করে। একে-ওকে দিয়ে সে অনেক সুপারিশও করিয়েছিল, কিন্তু আমরা সবাই কোমর বেঁধে বললাম, সে কিছুতেই হবে না।

সেইতো গতবার যখন আমাদের অভিনয় হয়েছিল, তাতে দাশু সেনাপতি সেজেছিল; সেবার সে অভিনয়টা একেবারে মাটি করে দিয়েছিল। যখন ত্রিচূড়ের গুপ্তচর সেনাপতির সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে বলল, ‘‘সাহস থাকিলে তবে খোল তলোয়ার !’’ দাশুর তখন ‘‘তবে আয় সম্মুখ সমরে’’—ব’লে তখনি তলোয়ার খুলবার কথা। কিন্তু দাশুটা আনাড়ির মতো টানাটানি করতে গিয়ে তলোয়ার তো খুলতেই পারল না, মাঝ থেকে ঘাবড়ে গিয়ে কথাগুলোও বলতে ভুলে গেল। তাই দেখে গুপ্তচর আবার ‘‘খোল তলোয়ার’’ ব’লে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। দাশুটা এমনি বোকা, সে অমনি ‘‘দাঁড়া, দেখছিস না বকলস্ আটকিয়ে গেছে’’ ব’লে চেঁচিয়ে তাকে এক ধমক দিয়ে উঠল। ভাগ্যিস আমি তাড়াতাড়ি তলোয়ার খুলে দিলাম, তা না হলে ঐখানেই অভিনয় বন্ধ হয়ে যেত। তারপর শেষের দিকে রাজা যখন জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘কিবা চাহ পুরস্কার কহ সেনাপতি,’’ তখন দাশুর বলবার কথা ছিল ‘‘নিত্যকাল থাকে যেন রাজপদে মতি,’’ কিন্তু দাশুটা তা না ব’লে, তার পরের আর একটা লাইন আরম্ভ করেই, হঠাৎ জিভ কেটে ‘‘ঐ ভুলে গেছিলাম’’ ব’লে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। আমি কটমট করে তাকাতে, সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে ঠিক লাইনটা আরম্ভ করল।

তাই এবারে তার নাম হতেই আমরা জোর করে ব’লে উঠলাম, ‘‘না, সে কিছুতেই হবে না।’’ বিশু বলল, ‘‘দাশু একটিং করবে ? তাহলেই চিত্তির !’’ ট্যাঁপা বলল, ‘‘তার চাইতে ভজু মালিকে ডেকে আনলেই হয়!’’ দাশু বেচারা প্রথমে খুব মিনতি করল, তারপর চটে উঠল, তারপর কেমন মুষড়ে গিয়ে মুখ হাঁড়ি করে বসে রইল। যে কয়দিন আমাদের তালিম চলছিল, দাশু রোজ এসে চুপটি করে হলের এক কোনায় বসে বসে আমাদের অভিনয় শুনত। ছুটির

কয়েকদিন আগে থেকে দেখি, ফোর্থ ক্লাশের ছোট গণশার সঙ্গে দাশুর ভারি ভাব হয়ে গেছে। গণশা ছেলেমানুষ, কিন্তু সে চমৎকার আবৃত্তি করতে পারেড় তাই তাকে দেবদূতের পার্ট দেওয়া হয়েছে। দাশু রোজ তাকে নানারকম খাবার এনে খাওয়ায়, রঙিন পেনসিল আর ছবির বই এনে দেয়, আর বলে যে ছুটির দিন তাকে একটা ফুটবল কিনে দেবে। হঠাৎ গণশার উপর দাশুর এতখানি টান হবার কোনো কারণ আমরা বুঝতে পারলাম না। কেবল দেখতে পেলাম, গণশাটা খেলনা আর খাবার পেয়ে ভুলে 'দাশুদা'র একজন পরম ভক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

ছুটির দিনে আমরা যখন অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেল। আড়াইটা বাজতে না বাজতেই দেখা গেল, দাশুভায়া সাজঘরে ঢুকে পোশাক পরতে আরম্ভ করেছে। আঁমরা জিজ্ঞেস করলাম, "কিরে ? তুই এখানে কি করছিস ?" দাশু বলল, "বাঃ, পোশাক পরব না ?" আমি বললাম, "পোশাক পরবি কিরে ? তুই তো আর একটিং করবি না।" দাশু বলল, "বাঃ, খুব তো খবর রাখ। আজকে দেবদূত সাজবে কে জানো ?" শুনে হঠাৎ আমাদের মনে কেমন একটা খটকা লাগল, আমি বললাম, " কেন গণশার কি হল?" দাশু বলল, "কি হয়েছে তা গণশাকে জিজ্ঞেস করলেই পার?" তখন চেয়ে দেখি সবাই এসেছে, কেবল গণশাই আসেনি। অমনি রামপদ, বিশু আর আমি ছুটে বেরোলাম গণশার খোঁজে।

সারা ইস্কুল খুঁজে, শেষটায় টিফিনঘরের পিছনে হতভাগাকে খুঁজে পাওয়া গেল। সে আমাদের দেখেই পালাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমরা তাকে চটপট গ্রেপ্তার করে টেনে নিয়ে চললাম। গণশা কাঁদতে লাগল, "না আমি কক্ষনো একটিং করব না, তাহলে, দাশুদা আমায় ফুটবল দেবে না।" আমরা তবু তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় অঙ্কের মাস্টার হরিবাবু সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি আমাদের দেখেই ভয়ঙ্কর চোখ লাল করে ধমক দিয়ে উঠলেন, "তিন-তিনটে ধাড়ি ছেলে মিলে ঐ কচি ছেলেটার পিছনে লেগেছিস ? তোদের লজ্জাও করে না ?" ব'লেই আমাকে বিশুকে এক একটি চড় মেরে আর রামপদর কান ম'লে দিয়ে হনহন্ করে চলে গেলেন। এই সুযোগে হাতছাড়া হয়ে গণেশচন্দ্র আবার চম্পট দিল। আমরাও

অপমানটা হজম করে ফিরে এলাম। এসে দেখি, দাশুর সঙ্গে রাখালের মহা ঝগড়া লেগে গেছে। রাখাল বলছে, "তোকে আজ কিছুতেই দেবদূত সাজতে দেওয়া হবে না।" দাশু বলছে, "বেশ তো, তাহলে আর কেউ দেবদূত সাজুক, আমি রাজা কিম্বা মন্ত্রী সাজি। পাঁচ-ছটা পার্ট আমার মুখস্থ হয়ে আছে।" এমন সময় আমরা এসে খবর দিলাম, যে, গণশাকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না। তখন অনেক তর্কবিতর্ক আর ঝগড়া ঝাটির পর স্থির হল যে, দাশুকে আর ঘাঁটিয়ে দরকার নেই, তাকেই দেবদূত সাজতে দেওয়া হোক। শুনে দাশু খুব খুশী হল আর আমাদের শাসিয়ে রাখল যে, "আবার যদি তোরা কেউ গোলমাল করিস, তাহলে কিন্তু গতবারের মতো সব ভণ্ডুল করে দেব।"

তারপর অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম দৃশ্যে দাশু বিশেষ কিছু গোলমাল করেনি, খালি স্টেজের সামনে একবার পানের পিক্ ফেলেছিল। কিন্তু তৃতীয় দৃশ্যে এসে সে একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করল। এক জায়গায় তার খালি বলবার কথা, "দেবতা বিমুখ হলে মানুষ কি পারে ?" কিন্তু সে এই কথাটুকুর আগে কোত্থেকে আরও চার-পাঁচ লাইন জুড়ে দিল! আমি তাই নিয়ে আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু দাশু বলল, "তোমরা যে লম্বা বক্তৃতা কর সে বেলা দোষ হয় না, আমি দুটো কথা বেশি বললেই যত দোষ !" এও সহ্য করা যেত, কিন্তু শেষ দৃশ্যের সময় তার মোটেই আসবার কথা নয় তা জেনেও সে স্টেজে আসবার জন্য জেদ করে বসল। আমরা অনেক কষ্টে অনেক তোয়াজ করে তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, শেষ দৃশ্যে দেবদূত আসতেই পারে না, কারণ তার আগের দৃশ্যেই আছে যে দেবদূত বিদায় নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। শেষ দৃশ্যেও আছে যে মন্ত্রী রাজাকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, দেবদূত মহারাজকে আশীর্বাদ করে স্বর্গপুরীতে প্রস্থান করেছেন। দাশু অগত্যা তার জেদ ছাড়ল বটে, কিন্তু বেশ বোঝা গেল সে মনে মনে একটুও খুশি হয়নি।

শেষ দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম খানিকটা অভিনয়ের পর মন্ত্রী এসে সভায় হাজির হলেন। এ কথা সে কথার পর তিনি রাজাকে সংবাদ দিলেন, "বারবার মহারাজে আশিস্ করিয়া, দেবদূত গেল চলি স্বর্গ অভিমুখে।" বলতে বলতেই হঠাৎ এ রকম বাধা পেয়ে মন্ত্রী তার বক্তৃতার

খেই হারিয়ে ফেলল, আমরাও সকলে কি রকম যেন ঘাবড়িয়ে গেলাম— অভিনয় হঠাৎ বন্ধ হবার যোগাড় হয়ে এল। তাই দেখে দাশু সর্দারি করে মন্ত্রীকে বলল, "বলে যাও কি বলিতেছিলে।" তাতে মন্ত্রী আরও কেমন ঘাবড়িয়ে গেল। রাখাল প্রতিহারী সেজেছিল, দাশুকে কি যেন বলবার জন্যে যেই একটু এগিয়ে গেছে, অমনি দাশু "চেয়েছিল জোর করে ঠেকাতে আমারে এই হতভাগা"ড়্বলে এক চাঁটি মেরে তার মাথার পাগড়ি ফেলে দিল। ফেলে দিয়েই সে রাজার শেষ বক্তৃতাটা—"এ রাজ্যতে নাহি রবে হিংসা অত্যাচার, নাহি রবে দারিদ্র্য যাতনা" ইত্যাদি—নিজেই গড়গড় করে ব'লে গিয়ে, "যাও সবে নিজ নিজ কাজে" ব'লে অভিনয় শেষ করে দিল। আমরা কি করব বুঝতে না পেরে সব বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়ে রাইলাম। ওদিকে ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল আর ঝুপ্ করে পর্দাও নেমে গেল।

আমরা সব রেগে-মেগে লাল হয়ে দাশুকে তেড়ে ধরে বললাম, "হতভাগা, দ্যাখ দেখি সব মাটি করলি, অর্ধেক কথাই বলা হল না।" দাশু বলল, "বাঃ, তোমরা কেউ কিছু বলছ না দেখেই তো আমি তাড়াতাড়ি যা মনে ছিল সেইগুলো বলে দিলাম। তা না হলে তো আরো সব মাটি হয়ে যেত।" আমি বললাম, "তুই কেন মাঝখানে এসে গোল বাধিয়ে দিলি ? তাইতো সব ঘুলিয়ে গেল।" দাশু বলল, "রাখাল কেন বলেছিল যে আমায় জোর করে আটকিয়ে রাখবে ? তা ছাড়া তোমরা কেন আমায় গোড়া থেকে নিতে চাচ্ছিলে না আর ঠাট্টা করছিলে ? আর রামপদ কেন বারবার আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল ?" রামপদ বলল, "ওকে ধরে ঘা দুচার লাগিয়ে দে।"

দাশু বলল, 'লাগাও না, দেখবে আমি এক্ষুনি চেঁচিয়ে সকলকে হাজির করি কিনা?"

আমাদের রামপদ একদিন এক হাঁড়ি মিহিদানা লইয়া স্কুলে আসিল! টিফিনের ছুটি হওয়ামাত্র আমরা সকলেই মহা উৎসাহে সেগুলি ভাগ করিয়া খাইলাম। খাইল না কেবল দাশু।

পাগলা দাশু যে মিহিদানা খাইতে ভালোবাসে না, তা নয়। কিন্তু, রামপদকে সে একেবারেই পছন্দ করিত না—দুজনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া চলিত! আমরা রামপদকে বলিলাম, "দাশুকে কিছু দে!" রামপদ বলিল, "কি রে দাশু, খাবি নাকি? দেখিস, খাবার লোভ হয়ে থাকে তো বল আর আমার সঙ্গে কোনোদিন লাগতে আসবি নে- তা হলে মিহিদানা পাবি।" এমন করিয়া বলিলে তো রাগ হইবারই কথা, কিন্তু দাশু কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে হাত পাতিয়া মিহিদানা লইল, তার পর দারোয়ানের কুকুরটাকে ডাকিয়া সকলের সামনে তাহাকে সেই মিহিদানা খাওয়াইল! তার পর খানিকক্ষণ হাঁড়িটার দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে হাসিতে স্কুলের বাহিরে চলিয়া গেল। এদিকে হাঁড়িটাকে শেষ করিয়া আমরা সকলে খেলায় মাতিয়া গেলাম—দাশুর কথা কেউ আর ভাবিবার সময় পাই নাই।

টিফিনের পর ক্লাশে আসিয়া দেখি দাশু অত্যন্ত শান্তশিষ্টভাবে এককোণে বসিয়া আপন মনে অঙ্ক কষিতেছে। তখনই আমাদের কেমন সন্দেহ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রে দাশু, কিছু করেছিস নাকি?" দাশু অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো বলিল, "হ্যাঁ, দুটো জি-সি-এম করে ফেলেছি।" আমরা বলিলাম, "ধুৎ! সে কথা কে বলছে? কিছু দুষ্টুমির মতলব করিস নি তো?" এ কথায় দাশু ভয়ানক চটিয়া গেল। তখন পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশে আসিতেছিলেন, দাশু তাঁহার কাছে নালিশ করে আর কি! আমরা অনেক কষ্টে তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিলাম।

এই পণ্ডিত মহাশয় মানুষটি মন্দ নহেন। পড়ার জন্য কোনোদিনই তাড়াহুড়া করেন না। কেবল মাঝে মাঝে একটু বেশি গোল করিলে হঠাৎ সাংঘাতিকরকম চটিয়া যান। সে সময় তাঁর মেজাজটি আশ্চর্যরকম ধারালো

হইয়া উঠে। পণ্ডিত মহাশয় চেয়ারে বসিয়াই, ‘‘নদী শব্দের রূপ কর’’ বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমরা বই খুলিয়া, হড়্‌বড়্‌ করিয়া যা তা খানিকটা বলিয়া গেলাম এবং তাহার উত্তরে পণ্ডিত মহাশয়ের নাকের ভিতর হইতে অতি সুন্দর ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম নিদ্রা বেশ গভীর হইয়াছে। কাজেই আমরাও শ্লেট লইয়া ‘কাটকুট’ আর ‘দশ-পঁচিশ’ খেলা শুরু করিলাম। কেবল মাঝে মাঝে যখন ঘড়্‌ঘড়ানি কমিয়া আসিত, তখন সবাই মিলিয়া সুর করিয়া ‘নদী নদ্যৌ নদ্যঃ’ ইত্যাদি আওড়াইতাম। দেখিতাম, তাহাতে ঘুমপাড়ানি গানের ফল খুব আশ্চর্যরকম পাওয়া যায়।

সকলে খেলায় মত্ত, কেবল দাশু এককোনায় বসিয়া কি যেন করিতেছে- সেদিকে আমাদের কোনো খেয়াল নাই। একটু বাদে পণ্ডিত মহাশয়ের চেয়ারের তলায় তক্তার নীচ হইতে ‘ফট্’ করিয়া কি একটা আওয়াজ হইল। পণ্ডিত মহাশয় ঘুমের ঘোরে ভ্রূকুটি করিয়া সবেমাত্র ‘উঃ’ বলিয়া কি যেন একটা ধমক দিতে যাইবেন, এমন সময় ফুট্‌ফাট্, দুম্‌দাম্, ধুপ্‌ধাপ্ শব্দে তাণ্ডব কোলাহল উঠিয়া সমস্ত স্কুলটিকে একেবারে কাঁপাইয়া তুলিল। মনে হইল যেন যত রাজ্যের মিস্ত্রি-মজুর সবাই একজোটে বিকট তালে ছাত পিটাইতে লাগিয়াছে- দুনিয়ার কাঁসারি আর লাঠিয়াল সবাই যেন পাল্লা দিয়ে হাতুড়ি আর লাঠি ঠুকিতেছে। খানিকক্ষণ পর্যন্ত আমরা, যাহাকে পড়ার বইয়ে ‘কিংকর্তব্যবিমূঢ়’ বলে, তেমনি হইয়া হাঁ করিয়া রহিলাম। পণ্ডিত মহাশয় একবার মাত্র বিকট শব্দ করিয়া তার পর হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়িয়া একলাফে টেবিল ডিঙাইয়া একেবারে ক্লাশের মাঝখানে ধড়্‌ফড়্ করিয়া পড়িয়া গেলেন। সরকারি কলেজের নবীন পাল বরাবর ‘হাইজাম্পে’ ফার্স্ট প্রাইজ পায়; তাহাকেও আমরা এরকম সাংঘাতিক লাফাইতে দেখি নাই। পাশের ঘরে নীচের ক্লাশের ছেলেরা চীৎকার করিয়া ‘কড়াকিয়া’ মুখস্থ আওড়াইতেছিল- গোলমালে তারাও হঠাৎ আড়ষ্ট হইয়া থামিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে স্কুলময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল- দারোয়ানের কুকুরটা পর্যন্ত যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া বিকট কেঁউ কেঁউ শব্দে গোলমালের মাত্রা ভীষণরকম বাড়াইয়া তুলিল।

মিনিট পাঁচেক ভয়ানক আওয়াজের পর যখন সব ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, তখন পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, ‘‘কিসের শব্দ হইয়াছিল দেখ।’’ দারোয়ানজি

একটা লম্বা বাঁশ দিয়া অতি সাবধানে, আস্তে আস্তে তক্তার নীচ হইতে একটা হাঁড়ি ঠেলিয়া বাহির করিল- রামপদর সেই হাঁড়িটা; তখনো তার মুখের কাছে একটু মিহিদানা লাগিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় ভয়ানক ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, “এ হাঁড়ি কার?” রামপদ বলিল, “আজ্ঞে, আমার।” আর কোথা যায়- অমনি দুই কানে দুই পাক! “হাঁড়িতে কি রেখেছিলি?” রামপদ তখন বুঝিতে পারিল যে গোলমালের জন্য সমস্ত দোষ তাহারই ঘাড়ে আসিয়া পড়িতেছে! সে বেচারা তাড়াতাড়ি বুঝাইতে গেল, “আজ্ঞে, ওর মধ্যে করে মিহিদানা এনেছিলাম, তার পর—” মুখের কথা শেষ না হইতেই পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, “তার পর মিহিদানাগুলো চীনে পটকা হয়ে ফুটতে লাগল, না?” বলিয়াই ঠাস্ ঠাস্ করিয়া দুই চড়।

অন্যান্য মাস্টারেরাও ক্লাশে আসিয়া জড়ো হইয়াছিলেন; তাঁহারাও একবাক্যে হাঁ হাঁ করিয়া রুখিয়া আসিলেন। আমরা দেখিলাম বেগতিক। বিনা দোষে রামপদ বেচারা মার খায় বুঝি! এমন সময় দাশু আমার শ্লেটখানা লইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে দেখাইয়া বলিল, “এই দেখুন, আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, তখন ওরা শ্লেট নিয়ে খেলা করছিল—এই দেখুন, কাটকুটের ঘর কাটা।” শ্লেটের উপর আমার নাম লেখা—পণ্ডিত মহাশয় আমার উপর প্রচণ্ড এক চড় তুলিয়াই হঠাৎ কেমন থতমত খাইয়া গেলেন। তাহার পর দাশুর দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, “চোপ্ রও, কে বলেছে আমি ঘুমোচ্ছিলাম?” দাশু খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া বলিল, “তবে যে আপনার নাক ডাকছিল?” পণ্ডিতমহাশয় তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেন, “বটে? ওরা সব খেলা কচ্ছিল? আর তুমি কি কচ্ছিলে?” দাশু অম্লানবদনে বলিল, “আমি তো পটকায় আগুন দিচ্ছিলাম।” শুনিয়াই তো সকলের চক্ষুস্থির! ছোকরা বলে কি?

প্রায় আধ মিনিটখানেক কাহারো মুখে আর কথা নাই! তার পর পণ্ডিত মহাশয় ঘাড় বাঁকাইয়া গম্ভীর গলায় হুংকার দিয়া বলিলেন, “কেন পটকায় আগুন দিচ্ছিলে?” দাশু ভয় পাইবার ছেলেই নয়, সে রামপদকে দেখাইয়া বলিল, “ও কেন আমায় মিহিদানা দিতে চাচ্ছিল না?” এরূপ অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া রামপদ বলিল, “আমার মিহিদানা আমি যা ইচ্ছা তাই করব।” দাশু

তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, ‘‘তা হলে, আমার পটকা, আমিও যা ইচ্ছা তাই করব।’’ এরূপ পাগলের সঙ্গে আর তর্ক করা চলে না! কাজেই মাস্টারেরা সকলেই কিছু কিছু ধমকধামক করিয়া যে যার ক্লাশে চলিয়া গেলেন। সে ‘পাগলা’ বলিয়া তাহার কোনো শাস্তি হইল না।

ছুটির পর আমরা সবাই মিলিয়া কত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে তাহার দোষ বুঝাইতে পারিলাম না। সে বলিল, ‘‘আমার পটকা রামপদর হাঁড়ি। যদি আমার দোষ হয়, তা হলে রামপদরও দোষ হয়েছে। ব্যস্! ওর মার খাওয়াই উচিত।’’

নবীনচাঁদ স্কুলে এসেই বলল, কাল তাকে ডাকাতে ধরেছিল। শুনে স্কুলশুদ্ধ সবাই হাঁ হাঁ করে ছুটে আসল। ‘‘ডাকাতে ধরেছিল? কি বলিস রে?’’ ডাকাত না তো কি? বিকেলবেলায় সে জ্যোতিলালের বাড়ি পড়তে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরবার সময়ে ডাকতেরা তাকে ধরে, তার মাথায় চাঁটি মেরে, তার নতুন কেনা শখের পিরানটিতে কাদাজলের পিচকিরি দিয়ে গেল। আর যাবার সময় বলে গেল, ‘‘চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্-নইলে দড়াম্ করে তোর মাথা উড়িয়ে দেব।’’ তাই সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রাস্তার ধারে প্রায় বিশ মিনিট দাঁড়িয়েছিল; এমন সময় তার বড়মামা এসে তার কান ধরে বাড়িতে নিয়ে বললেন, ‘‘রাস্তায় সং সেজে এয়ার্কি করা হচ্ছিল?’’ নবীনচাঁদ কাঁদ-কাঁদ গলায় বলে উঠল ‘‘আমি কি করব? আমায় ডাকাত ধরেছিল-’’ শুনে তার মামা প্রকাণ্ড এক চড় তুলে বললেন, ‘‘ফের জ্যাঠামি!’’ নবীনচাঁদ দেখল মামার সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা- কারণ, সত্যিসত্যিই তাকে যে ডাকাতে ধরেছিল, এ কথা তার বাড়ির কাউকে বিশ্বাস করানো শক্ত! সুতরাং তার মনের দুঃখ এতক্ষণ মনের মধ্যেই চাপা ছিল।

যাহোক, স্কুলে এসে তার দুঃখ বোধ হয় অনেকটা দূর হতে পেরেছিল, কারণ, স্কুলের অন্তত অর্ধেক ছেলে তার কথা শুনবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে পড়েছিল, এবং তার ঘামাচি, ফুসকুড়ি আর চুলকানির দাগটি পর্যন্ত তারা আগ্রহ করে ডাকাতির সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে স্বীকার করেছিল। দুয়েকজন, যারা তার কনুয়ের আঁচড়টাকে পুরনো বলে সন্দেহ করেছিল, তারাও বলল যে হাঁটুর কাছে যে ছড়ে গেছে সেটা একেবারে টাটকা নতুন। কিন্তু তার পায়ের গোড়ালিতে যে ঘায়ের মত ছিল সেটাকে দেখে কেষ্টা যখন বলল, ‘‘ওটা তো জুতোর ফোস্কা,’’ তখন নবীনচাঁদ ভয়ানক চটে বলল, ‘‘যাও, তোমাদের কাছে আর কিচ্ছু বলব না!’’ কেষ্টাটার জন্য আমাদের আর কিছুই শোনা হল না।

ততক্ষণে দশটা বেজে গেছে, ঢং ঢং করে স্কুলের ঘণ্টা পড়ে গেল। সবাই যে যার ক্লাশে চলে গেলাম, এমন সময় দেখি পাগলা দাশু একগাল হাসি

নিয়ে ক্লাশে ঢুকছে। আমরা বললাম, ‘‘শুনেছিস? কাল নবুকে ডাকাতে ধরেছিল।’’ যেমন বলা, অমনি দাশরথি হঠাৎ হাত-পা ছেড়ে বইটই ফেলে খ্যাঃ খ্যাঃ খ্যাঃ খ্যাঃ করে হাসতে হাসতে একেবারে মেঝের ওপর বসে পড়ল! পেটে হাত দিয়ে গড়াগড়ি করে, একবার চিত হয়ে, একবার উপুড় হয়ে, তার হাসি আর কিছুতেই থামে না! দেখে আমরা তো অবাক! পণ্ডিত মশাই ক্লাশে এসেছেন, তখনো পুরোদমে তার হাসি চলছে। সবাই ভাবল, ‘‘ছোঁড়াটা খেপে গেল নাকি?’’ যা হোক, খুব খানিকটা হুটোপুটির পর সে ঠান্ডা হয়ে, বইটই গুটিয়ে বেঞ্চের উপর উঠে বসল। পণ্ডিতমশাই বললেন, ‘‘ওরকম হাসছিলে কেন?’’ দাশু নবিনচাঁদকে দেখিয়ে বলল, ‘‘ঐ ওকে দেখে।’’ পণ্ডিতমশাই খুব কড়ারকমের ধমক লাগিয়ে তাকে ক্লাসের কোনায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। কিন্তু পাগলার তাতেও লজ্জা নেই, সে সারাটি ঘন্টা থেকে থেকে বই দিয়ে মুখ আড়াল করে ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে লাগল।

টিফিনের ছুটির সময়ে নবু দাশুকে চেপে ধরল, ‘‘কিরে দেশো! বড়ো যে হাসতে শিখেছিস!’’ দাশু বলল, ‘‘হাসব না? তুমি কাল ধুনচি মাথায় দিয়ে কি রকম নাচটা নেচেছিলে, সে তো আর তুমি নিজে দেখনি? দেখলে বুঝতে কেমন মজা!’’ আমরা সবাই বললাম, ‘‘সে কি রকম? ধুনচি মাথায় নাচছিল মানে?’’ দাশু বলল ‘‘তাও জান না? ঐ কেষ্টা আর জগাই- ঐ যা! বলতে না বারণ করেছিল!’’ আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, ‘‘কি বলছিস ভালো করেই বল-না।’’ দাশু বলল, ‘‘কালকে শেঠেদের বাগানের পেছন দিয়ে নবু একলা একলা বাড়ি যাচ্ছিল, এমন সময়ে দুটো ছেলে- তাদের নাম বলতে বারণ- তারা দৌড়ে এসে নবুর মাথায় ধুনচির মতো কি একটা চাপিয়ে তার গায়ের উপর আচ্ছা করে পিচকিরি দিয়ে পালিয়ে গেল!’’ নবু ভয়ানক রেগে বলল, ‘‘তুই তখন কি করছিলি?’’ দাশু বলল, ‘‘তুমি তখন মাথার থলি খুলবার জন্য ব্যাঙের মতো হাত-পা ছুড়ে লাফাচ্ছিলে দেখে আমি বললাম, ফের নড়বি তো দড়াম্ করে মাথা উড়িয়ে দেব। তাই শুনে তুমি রাস্তার মধ্যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে, তাই আমি তোমার বড়োমামাকে ডেকে আনলাম।’’ নবীনচাঁদের যেমন বাবুয়ানা, তেমনি তার দেমাক—সেইজন্য কেউ তাকে পছন্দ করত না, তার লাঞ্ছনার বর্ণনা শুনে সবাই বেশ খুশি হলাম। ব্রজলাল ছেলেমানুষ, সে

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বলব, “তবে যে নবীনদা বলছিল তাকে ডাকাতে ধরেছে?” দাশু বলল, “দূর বোকা! কেষ্টা কি ডাকাত?” বলতে না বলতেই কেষ্টা সেখানে এসে হাজির। কেষ্টা আমাদের উপরের ক্লাসে পড়ে, তার গায়েও বেশ জোর আছে। নবীনচাঁদ তাকে দেখামাত্র শিকারি বেড়ালের মতো ফুলে উঠল। কিন্তু মারামারি করতে সাহস পেল না, খানিকক্ষণ কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল। আমরা ভাবলাম গোলমাল মিটে গেল!

কিন্তু তার পরদিন ছুটির সময় দেখি, নবীন তার দাদা মোহনচাঁদকে নিয়ে হন্‌হন্‌ করে আমাদের দিকে আসছে। মোহনচাঁদ এন্‌ট্রান্স ক্লাসে পড়ে, সে আমাদের চাইতে অনেক বড়ো, তাকে ওরকমভাবে আসতে দেখেই আমরা বুঝলাম এবার একটা কাণ্ড হবে। মোহন এসেই বলল, “কেষ্টা কই?” কেষ্টা দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়েই কোথায় সরে পড়েছে, তাই তাকে আর পাওয়া গেল না। তখন নবীনচাঁদ বলল “ওই দাশুটা সব জানে, ওকে জিজ্ঞাসা কর।” মোহন বলল, “কি হে ছোকরা তুমি সব জান নাকি?” দাশু বলল, “না, সব আর জানব কোত্থেকে- এই তো সবে ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, একটু ইংরিজি জানি, ভূগোল, বাংলা, জিওমেট্রি-” মোহনচাঁদ ধমক দিয়ে বলল, “সেদিন নবুকে যে কারা সব ঠেঙিয়েছিল, তুমি তার কিছু জান কি না?” দাশু বলল, ঠ্যাঙায় নি তো- মেরেছিল, খুব আস্তে মেরেছিল।” মোহন একটুখানি ভেংচিয়ে বলল, “খুব আস্তে মেরেছে, না? কতখানি আস্তে শুনি তো?” দাশু বলল, “সে কিছুই না- ওরকম মারলে একটুও লাগে না।” মোহন আবার ব্যঙ্গ করে বলল, “তাই নাকি? কি রকম মারলে পরে লাগে?” দাশু খানিকটা মাথা চুলকিয়ে তার পর বললে, “ঐ সেবার হেডমাস্টার মশাই তোমায় যেমন বেত মেরেছিলেন সেইরকম!” এই কথায় মোহন ভয়ানক চটে দাশুর কান মলে দিয়ে চীৎকার করে বলল, “দ্যাখ বেয়াদব। ফের জ্যাঠামি করবি তো চাবকিয়ে লাল করে দেব। তুই সেখানে ছিলি কিনা। আর কি কি দেখেছিলি, সব খুলে বলবি কিনা?”

জানই তো দাশুর মেজাজ কেমন পাগলাটে গোছের, সে একটুখানি কানে হাত বুলিয়ে তার পর মোহনচাঁদকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে বসল। কিল, ঘুঁষি, চড়, আঁচড়, কামড়, সে এমনি চটপট চালিয়ে গেল জে আমরা সবাই হাঁ

করে তাকিয়ে রইলাম। মোহন বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবে নি যে ফোর্থ ক্লাশের একটা রোগাছেলে তাকে অমনভাবে তেড়ে আসতে সাহস পাবে—তাই সে একেবারে থতমত খেয়ে কেমন যেন লড়তেই পারল না। দাশু তাকে পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে মাটিতে চিৎ করে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "এর চাইতেও ঢের আস্তে মেরেছিল।" এনট্রান্স ক্লাশের কয়েকটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। তারা যদি মোহনকে সামলে না ফেলত, তা হলে সেদিন তার হাত থেকে দাশুকে বাঁচানোই মুস্কিল হত।

পরে একদিন কেষ্টাকে জিঞ্জেস করা হয়েছিল, "হাঁ রে, নবুকে সেদিন তোরা অমন করলি কেন?" কেষ্টা বলল, "ঐ দাশুটাই তো শিখিয়েছিল ওরকম করতে। আর বলেছিল, 'তা হলে এক সের জিলিপি পাবি'!" আমরা বললাম, "কই, আমাদের তো ভাগ দিলি নে?" কেষ্টা বলল, "সে কথা আর বলিস কেন? জিলিপি চাইতে গেলুম, হতভাগা বলে কিনা 'আমার কাছে কেন? ময়রার দোকানে যা, পয়সা ফেলে দে, যত চাস জিলিপি পাবি'।"

আচ্ছা, দাশু কি সত্যি সত্যি পাগল, না, কেবল মিচ্‌কেমি করে?

শ্যামচাঁদের বাবা কোন একটা সাহেব-অফিসে মস্ত কাজ করিতেন, তাই শ্যামচাঁদের পোষাক পরিচ্ছদে, রকম-সকমে কায়দার অন্ত ছিল না। সে যখন দেড় বিঘৎ চওড়া কলার আঁটিয়া, রঙিন ছাতা মাথায় দিয়া, নতুন জুতার মচ্‌মচ্‌ শব্দে গম্ভীর চালে ঘাড় উঁচাইয়া স্কুলে আসিত, তাহার সঙ্গে পাগড়িবাঁধা তক্‌মা-আঁটা চাপরাশি এক রাজ্যের বই ও টিফিনের বাক্স বহিয়া আনিত, তখন তাহাকে দেখাইত ঠিক যেন পেখমধরা ময়ূরটির মতো! স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা হাঁ করিয়া অবাক হইয়া থাকিত, কিন্তু আমরা সবাই একবাক্যে বলিতাম "চালিয়াৎ"।

বয়সের হিসাবে শ্যামচাঁদ একটু বেঁটে ছিল। পাছে কেহ তাকে ছেলেমানুষ ভাবে, এবং যথোপযুক্ত খাতির না করে, এই জন্য সর্বদাই সে অত্যন্ত বেশি রকম গম্ভীর হইয়া থাকিত এবং কথাবার্তায় নানা রকম বোলচাল দিয়া এমন বিজ্ঞের মত ভাব প্রকাশ করিত যে, স্কুলের দারোয়ান হইতে নিচের ক্লাশের ছাত্র পর্যন্ত সকলেই ভাবিত, 'নাঃ, লোকটা কিছু জানে!' শ্যামচাঁদ প্রথমে যেবার ঘড়ি-চেইন আঁটিয়া স্কুলে আসিল, তখন তাহার কাণ্ড যদি দেখিতে! পাঁচ মিনিট অন্তর ঘড়িটাকে বাহির করিয়া সে কানে দিয়া শুনিত, ঘড়িটা চলে কিনা! পাঁড়েজি দারোয়ানকে রীতিমত ধমক লাগাইয়া বলিত, "এইও! স্কুলের ক্লক্‌টাকে যখন চাবি দাও, তখন সেটাকে রেগুলেট কর না কেন ? ওটাকে অয়েল করতে হবে- ক্রমাগতই শ্লো চলছে।" পাঁড়েজির চৌদ্দ পুরুষে কেউ কখনও ঘড়ি 'অয়েল' বা 'রেগুলেট' করে নাই। সে যে সপ্তাহে একদিন করিয়া চাবি ঘুরাইতে শিখিয়াছে, ইহাতেই তাহার দেশের লোকের বিস্ময়ের সীমা নাই । কিন্তু দেশভাইদের কাছে মানরক্ষা করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "হাঁ, হাঁ, আভি হাম্‌ রেংলিট করবে।" পাঁড়েজির উপর একচাল চালিয়া শ্যামচাঁদ ক্লাশে ফিরিতেই এক পাল ছোট ছেলে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল । শ্যামচাঁদ তাহাদের কাছে মহা আড়ম্বর করিয়া শ্লো, ফাস্ট, মেইন স্প্রিং, রেগুলেট প্রভৃতি ঘড়ির সমস্ত রহস্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

একবার আমাদের একটি নতুন মাস্টার ক্লাশে আসিয়াই শ্যামচাঁদকে 'খোকা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। লজ্জায় ও অপমানে শ্যামচাঁদের মুখ একেবারে লাল হইয়া উঠিল। সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে আমার নাম শ্যামচাঁদ ঘটক।" মাস্টার মহাশয় অত কি বুঝিবেন, বলিলেন, "শ্যামচাঁদ? আচ্ছা বেশ, খোকা বস।" তারপর কয়েকদিন ধরিয়া স্কুল সুদ্ধ ছেলে তাহাকে 'খোকা' 'খোকা' বলিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু কয়দিন পরেই শ্যামচাঁদ ইহার প্রতিশোধ লইয়া ফেলিল। সেদিন ক্লাশে আসিয়াই পকেট হইতে কালো চোঙ্গার মতো কি একটা বাহির করিল। মাস্টার মহাশয়, শাদাসিধে ভালোমানুষ, তিনি বলিলেন, "কি হে খোকা, থার্‌মোমিটার এনেছ যে! জ্বর-টর হয় নাকি?" শ্যামচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে না- থার্‌মোমিটার নয়, ফাউন্টেন পেন!" শুনিয়া সকলের চক্ষু স্থির। ফাউন্টেন পেন! মাস্টার এবং ছেলে সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতে আসিলেন ব্যাপারখানা কি! শ্যামচাঁদ বলিল, "এই একটা ভাল্‌কেনাইট টিউব, তার মধ্যে কালি ভরা আছে।" একটা ছেলে উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ও বুঝেছি, পিচকিরি বুঝি?"। শ্যামচাঁদ কিছু জবাব না দিয়া, খুব মাতব্বরের মতো একটুখানি মুচকি হাসিয়া, কলমটিকে খুলিয়া তাহার সোনালি নিবখানি দেখাইয়া বলিল, "ওতে ইরিডিয়াম আছে- সোনার চেয়েও বেশি দাম।" তারপর যখন সে একখানা খাতা লইয়া, সেই আশ্চর্য কলম দিয়া তর্‌তর্‌ করিয়া নিজের নাম লিখিতে লাগিল, তখন স্বয়ং মাস্টার মহাশয় পর্যন্ত বড় বড় চোখ করিয়া দেখিতে লাগিলেন । তারপর, শ্যামচাঁদ কলমটিকে তাঁর হাতে দিবামাত্র তিনি ভারি খুশি হইয়া সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দুই ছত্র লিখিয়া বলিলেন, "কি কলমই না বানিয়েছে, বিলিতি কোম্পানি বুঝি?" শ্যামচাঁদ চট্‌পট্‌ বলিয়া ফেলিল, "আমেরিকান স্টাইলো এন্ড ফাউন্টেন পেন কো, ফিলাডেলফিয়া।"

ক্রমে পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। ছুটির দিন স্কুলের উদ্যানে প্রকাণ্ড শামিয়ানা খাটানো হইল, কলিকাতা হইতে কে এক বাজিওয়ালা আসিয়াছেন, তিনি ম্যাজিক দেখাইবেন। যথাসময়ে সকলে আসিলেন, মাস্টার ছাত্র লোকজন নিমন্ত্রিত অভ্যাগত সকলে মিলিয়া উঠান সিঁড়ি পাঁচিল একেবারে ভরিয়া ফেলিয়াছে। ম্যাজিক চলিতে লাগিল। একখানা সাদা রুমাল চোখের সামনেই লাল নীল সবুজের কারিকুরিতে রঙিন হইয়া উঠিল। একজন লোক

একটা সিদ্ধ ডিম গিলিয়া মুখের মধ্য হইতে এগারোটি আস্ত ডিম বাহির করিল। ডেপুটিবাবুর কোচম্যানের দাড়ি নিংড়াইয়া প্রায় পঞ্চাশটি টাকা বাহির করা হইল। তারপর ম্যাজিকওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "কারও কাছে ঘড়ি আছে?" শ্যামচাঁদ তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমার কাছে ঘড়ি আছে।" ম্যাজিকওয়ালা তাহার ঘড়িটি লইয়া খুব গম্ভীরভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। ঘড়িটির খুব প্রশংসা করিয়া বলিল, "তোফা ঘড়ি তো!" তারপর চেনসুদ্ধ ঘড়িটাকে একটা কাগজে মুড়িয়া, একটা হামানদিস্তায় দমাদম্ ঠুকিতে লাগিল। তারপর কয়েক টুকরা ভাঙা লোহা আর কাঁচ দেখাইয়া শ্যামচাঁদকে বলিল, "এটাই কি তোমার ঘড়ি?" শ্যামচাঁদের অবস্থা বুঝিতেই পার! সে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল, দু-তিন বার কি যেন বলিতে গিয়া আবার থামিয়া গেল। শেষটায় অনেক কষ্টে একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, রুমাল দিয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে বসিয়া পড়িল। যাহা হউক, খানিকবাদে যখন একখানা পাঁউরুটির মধ্যে ঘড়িটাকে আস্ত অবস্থায় পাওয়া গেল, তখন চালিয়াৎ খুব হো হো করে হাসিয়া উঠিল, যেন তামাশাটা সে আগাগোড়াই বুঝিতে পারিয়াছে। সব শেষে ম্যাজিকওয়ালা নানাজনের কাছে নানারকম জিনিস চাহিয়া লইল- চশমা, আংটি, মানিব্যাগ, রুপার পেনসিল প্রভৃতি আট-দশটি জিনিস সকলের সামনে এক সঙ্গে পোঁটলা বাধিয়া শ্যামচাঁদকে ডাকিয়া তাহার হাতে পোঁটলাটি দেওয়া হইল। শ্যামচাঁদ বুক ফুলাইয়া পোঁটলা হাতে দাঁড়াইয়া রহিল আর ম্যাজিকওয়ালা লাঠি ঘুরাইয়া, চোখ-টখ পাকাইয়া, বিড়-বিড় করিয়া কি সব বকিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ শ্যামচাঁদের দিকে ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, "জিনিসগুলো ফেললে কোথায়?" শ্যামচাঁদ পোঁটলা দেখাইয়া বলিল, "এই যে।" ম্যাজিকওয়ালা মহা খুশি হইয়া বলিল, "সাবাস ছেলে! দাও, পোঁটলা খুলে যার যার জিনিস ফেরৎ দাও।" শ্যামচাঁদ তাড়াতাড়ি পোঁটলা খুলিয়া দেখে, তাহার মধ্যে খালি কয়েক টুকরো কয়লা আর ঢিল! তখন ম্যাজিকওয়ালার তম্বি দেখে কে? সে কপালে হাত ঠুকিয়া বলিতে লাগিল, "হায়, হায়, আমি ভদ্রলোকের কাছে মুখ দেখাই কি করে ? কেনই বা ওর কাছে দিতে গেছিলাম? ওহে ওসব তামাশা এখন রাখ, আমার জিনিসগুলো ফিরিয়ে দাও দেখি?" শ্যামচাঁদ হাসিবে কি কাঁদিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল ন—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। তখন ম্যাজিকওয়ালা

তাহার কানের মধ্য হইতে আংটি, চুলের মধ্য হইতে পেনসিল, আস্তিনের মধ্যে চশমা- এইরূপে একটি একটি জিনিস উদ্ধার করিতে লাগিল । আমরা হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলাম- শ্যামচাঁদও প্রাণপণে হাসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । কিন্তু সমস্ত জিনিসের হিসাব মিলাইয়া ম্যাজিকওয়ালা যখন তাহাকে বলিল, ‘‘আর কি নিয়েছ ?’’ তখন সে বাস্তবিকই ভয়ানক রাগিয়া বলিল, ‘‘ফের মিছে কথা ! কখনো আমি কিছু নিইনি ।’’ তখন ম্যাজিকওয়ালা তাহার কোটের পিছন হইতে একটা পায়রা বাহির করিয়া বলিল, ‘‘এটা বুঝি কিছু নয় ?’’

এবার শ্যামচাঁদ একেবারে ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল । তারপর পাগলের মতো হাত পা ছুঁড়িয়া সভা হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। আমরা সবাই আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া চেঁচাইতে লাগিলাম- চালিয়াৎ! চালিয়াৎ!

আমাদের 'সবজান্তা' দুলিরামের বাবা কোন একটা খবরের কাগজের সম্পাদক। সেই জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেরই মনে তাহার সমস্ত কথার উপরে অগাধ বিশ্বাস দেখা যাইত। যে কোনো বিষয়েই হোক, জার্মানির লড়াইয়ের কথাটাই হোক আর মোহনবাগানের ফুটবলের ব্যাখ্যাই হোক, দেশের বড় লোকদের ঘরোয়া গল্পই হোক, আর নানারকম উৎকট রোগের বর্ণনাই হোক, যে কোনো বিষয়ে সে মতামত প্রকাশ করিত। একদল ছাত্র অসাধারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে সে সকল কথা শুনিত। মাস্টার মহাশয়দের মধ্যেও কেহ কেহ এ বিষয়ে তাহার ভারি পক্ষপাতী ছিলেন। দুনিয়ার সকল খবর লইয়া সে কারবার করে, সেইজন্য পণ্ডিত মহাশয় তাহার নাম দিয়াছিলেন 'সবজান্তা'। আমার কিন্তু রবাবরই বিশ্বাস ছিল যে, সবজান্তা যতখানি পাণ্ডিত্য দেখায়, আসলে তাহার অনেকখানি উপরচালাকি। দু-চারটি বড়-বড় শোনা কথা আর খবরের কাগজ পড়িয়া দু-দশটা খবর—এইমাত্র তাহার পুঁজি, তারই উপর রঙচঙ দিয়া নানারকম বাজে গল্প জুড়িয়া সে তাহার বিদ্যা জাহির করিত।

একদিন আমাদের ক্লাশে পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে সে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের গল্প করিয়াছিল। তাহাতে সে বলে যে, নায়েগ্রা দশ মাইল উঁচু ও একশত মাইল চওড়া! একজন ছাত্র বলিল, "সে কি করে হবে? এভারেস্ট সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, সে-ই মোটে পাঁচ মাইল।" সবজান্তা তাকে বাধা দিয়া বলিল, "তোমরা তো আজকাল খবর রাখ না।" যখনই তার কথায় আমরা সন্দেহ বা আপত্তি করিতাম, সে একটা যা তা নাম করিয়া আমাদের ধমক দিয়া বলিত, "তোমরা কি অমুকের চেয়ে বেশি জানো?" আমরা বাহিরে সব সহ্য করিয়া থাকিতাম, কিন্তু এক এক সময় রাগে গা জ্বলিয়া যাইত। সবজান্তা যে আমাদের মনের ভাবটা বুঝিত না, তাহা নয়। সে তাহা বিলক্ষণ বুঝিত এবং সর্বদাই এমন ভাব প্রকাশ করিত যে, আমরা তাহার কথাগুলি মানি বা না মানি, তাহাতে কিছুমাত্র আসে যায় না। নানারকম খবর ও গল্প জাহির করিবার সময় মাঝে মাঝে আমাদের শুনাইয়া বলিত, "অবিশ্যি কেউ কেউ আছেন, যাঁরা এসব কথা মানবেন না।" অথবা "যাঁরা না পড়েই খুব বুদ্ধিমান

তাঁরা নিশ্চয়ই এ-সব উড়িয়ে দিতে চাইবেন''— ইত্যাদি। ছোকরা বাস্তবিক অনেক রকম খবর রাখিত তার উপর বোলচালগুলিও বেশ ছিল ঝাঁঝালো রকমের, কাজেই আমরা বেশি তর্ক করিতে সাহস পাইতাম না।

তাহার পরে একদিন, কি কুক্ষণে, তাহার এক মামা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া, আমাদেরই স্কুলের কাছে বাসা লইয়া বসিলেন। তখন আর সবজান্তাকে পায় কে! তাহার কথাবার্তার দৌড় এমন আশ্চর্য রকম বাড়িয়া চলিল যে, মনে হইত বুঝি বা তাহার পরামর্শ ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পুলিসের পেয়াদা পর্যন্ত কাহারও কাজ চলিতে পারে না। স্কুলের ছাত্র মহলে তাহার খাতির ও প্রতিপত্তি এমন আশ্চর্য রকম জমিয়া গেল যে, আমরা কয়েক বেচারা, যাহারা বরাবর তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিয়া আসিয়াছি— একেবারে কোণঠাসা হইয়া রহিলাম। এমন কি আমাদের মধ্য হইতে দু-একজন তাহার দলে যোগ দিতেও আরম্ভ করিল।

অবস্থাটা শেষটায় এমন দাঁড়াইল যে, ইস্কুলে আমাদের টেকা দায় ! দশটার সময় মুখ কাঁচুমাচু করিয়া ক্লাশে ঢুকিতাম আর ছুটি হইলেই, সকলের ঠাট্টা-বিদ্রুপ হাসি-তামাশার হাত এড়াইবার জন্য দৌড়িয়া বাড়ি আসিতাম। টিফিনের সময়টুকু হেডমাস্টার মহাশয়ের ঘরের সামনে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো পড়াশুনা করিতাম।

এইরকম ভাবে কতদিন চলিত জানি না, কিন্তু একদিনের একটি ঘটনায় হঠাৎ সবজান্তা মহাশয়ের জারিজুরি সব এমনই ফাঁস হইয়া গেল যে, তাহার অনেকদিনকার খ্যাতি ঐ একদিনেই লোপ পাইল-আর আমরাও সেইদিন হইতে একটু মাথা তুলিতে পারিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সেই ঘটনারই গল্প বলিতেছি।

একদিন শোনা গেল, লোহারপুরের জমিদার রামলালবাবু আমাদের স্কুলে তিন হাজার টাকা দিয়াছেন—একটি ফুটবল গ্রাউন্ড ও খেলার সরঞ্জামের জন্য। আরও শুনিলাম, রামলালবাবুর ইচ্ছা সেই উপলক্ষে আমাদের একদিন ছুটি ও একদিন রীতিমতো ভোজের আয়োজন হয়! কয়দিন ধরিয়া এই

খবরটাই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। কবে ছুটি পাওয়া যাইবে, কবে খাওয়া এবং কি খাওয়া হইবে, এই সকল বিষয়ে জল্পনা চলিতে লাগিল। সবজান্তা দুলিরাম বলিল, যেবার সে দার্জিলিং গিয়াছিল, সেবার নাকি রামলালবাবু তাহাকে কেমন খাতির করিতেন, তাহার কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া কি কি প্রশংসা করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সে স্কুলে আগে এবং পরে, সারাটি টিফিনের সময় এবং সুযোগ পাইলে ক্লাশের পড়াশুনার ফাঁকেও নানা অসম্ভব রকম গল্প বলিত। 'অসম্ভব' বলিলাম বটে, কিন্তু তাহার চেলার দল সেসকল কথা নির্বিচারে বিশ্বাস করিতে একটুও বাধা বোধ করিত না।

একদিন টিফিনের সময় উঠানের বড় সিঁড়িটার উপর একদল ছেলের সঙ্গে বসিয়া সবজান্তা গল্প আরম্ভ করিল—একদিন আমি দাজিলিঙে লাটসাহেবের বাড়ির কাছেই ঐ রাস্তাটায় বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি রামলালবাবু হাসতে হাসতে আমার দিকে আসছেন, তাঁর সঙ্গে আবার এক সাহেব। রামলালবাবু বললেন, "দুলিরাম! তোমার সেই ইংরাজি কবিতাটা একবার এঁকে শোনাতে হচ্ছে। আমি এঁর কাছে তোমার সুখ্যাতি করছিলাম, তাই ইনি সেটা শুনবার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছেন!" উনি নিজে থেকে বলছেন, তখন আমি আর কি করি ? আমি সেই 'ক্যাসাবিয়াংকা' থেকে আবৃত্তি করলুম। তারপর দেখতে দেখতে যা ভিড় জমে গেল! সবাই শুনতে চায়, সবাই বলে, 'আবার কর।' মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম, নেহাত রামলালবাবু বললেন তাই আবার করতে হল।

এমন সময় কে যেন পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "রামলালবাবু কে ?" সকলে ফিরিয়া দেখি, একটি রোগা নিরীহগোছের পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোক সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছেন। সবজান্তা বলিল, "রামলালবাবু কে, তাও জানেন না? লোহারপুরের জমিদার রামলাল রায়।" ভদ্রলোকটি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তার নাম শুনেছি, সে তোমার কেউ হয় নাকি?" "না, কেউ হয় না, এমনি খুব ভাব আচে আমার সঙ্গে। প্রায়ই চিঠিপত্র চলে।" ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন, "রামলালবাবু লোকটি কেমন?" সবজান্তা উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "চমৎকার লোক। যেমন চেহারা তেমনি কথাবার্তা, তেমনি কায়দা-দুরস্ত। এই আপনার চেয়ে প্রায় আধ হাত খানেক

লম্বা হবেন, আর সেই রকম তাঁর তেজ! আমাকে তিনি কুস্তি শেখাবেন বলেছিলেন, আর কিছুদিন থাকলেই ওটা বেশ রীতিমতো শিখে আসতাম।" "বটে ! বয়সের পক্ষে খুব চালাক তো! বেশ তো কথাবার্তা বলতে পার ! কি নাম হে তোমার ?" সব জান্তা বলিল, "ডুলিরাম ঘোষ। রণদাবাবু ডেপুটি আমার মামা হন।" শুনিয়া ভদ্রলোকটি ভারি খুশি হইয়া হেডমাস্টার মহাশয়ের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ছুটির পর আমরা সকলেই বাহির হইলাম। ইস্কুলের সম্মুখেই ডেপুটিবাবুর বাড়ি। তার বাহিরের বারান্দায় দেখি, সেই ভদ্রলোকটি বসিয়া ডুলিরামের ডেপুটিমামার সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। ডুলিরামকে দেখিয়াই মামা ডাক দিয়া বলিলেন—"ডুলি, এদিকে আয়, এঁকে প্রণাম কর্—এটি আমরা ভাগনে ডুলিরাম।" ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, এর পরিচয় আমি আগেই পেয়েছি।" ডুলিরাম আমাদের দেখাইয়া খুব আড়ম্বর করিয়া ভদ্রলোকটিকে প্রণাম করিল। ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন, "আমার পরিচয় জানো না বুঝি?" সবজান্তা এবার আর 'জানি' বলিতে পারিল না, আমতা করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। ভদ্রলোকটি তখন বেশ একটু মুচকি মুচকি হাসিয়া আমাদের শুনাইয়া বলিলেন, "আমার নাম রামলাল রায়, লোহারপুরের রামলাল রায়।"

ডুলিরাম খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মুখখানা লাল করিয়া হঠাৎ এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া ছেলেরা রাস্তার উপর হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। তার পরের দিন আমরা স্কুলে আসিয়া দেখিলাম—সবজান্তা আসে নাই, তাহার নাকি মাথা ধরিয়াছে। নানা অজুহাতে সে দু-তিনদিন কামাই করিল, তারপর যেদিন স্কুলে আসিল, তখন তাহাকে দেখিবামাত্র তাহারই কয়েকজন চেলা "কিহে, রামলালবাবুর চিঠিপত্র পেলে?" বলিয়া তাহাকে একেবারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তারপর যতদিন সে স্কুলে ছিল, ততদিন তাহাকে খেপাইতে হইলে বেশি কিছু করা দরকার হইত না, একটিবার রামলালবাবুর খবর জিজ্ঞাসা করিলেই বেশ তামাশা দেখা যাইত।

সকল বিষয়েই সর্দারি করিতে যাওয়া ভোলানাথের ভারি একটা বদ অভ্যাস। যেখানে তাহার কিছু বলিবার দরকার নাই, সেখানে সে বিজ্ঞের মতো উপদেশ দিতে যায়, যে কাজের সে কিছুমাত্র বোঝে না সে কাজেও সে চটপট্ হাত লাগাইতে ছাড়ে না। এইজন্য গুরুজনেরা তাহাকে বলেন 'জ্যাঠা'—আর সমবয়সীরা বলে 'ফড়ফড়ি রাম' ! কিন্তু তাহাতে তাহার কোনো দুঃখ নাই, বিশেষ লজ্জাও নাই। সেদিন তাহার তিন ক্লাশ উপরের বড় বড় ছেলেরা যখন নিজেদের পড়াশুনা লইয়া আলোচনা করিতেছিল, তখন ভোলানাথ মুরুব্বির মতো গম্ভীর হইয়া বলিল, "ওয়েবস্টারের ডিক্সনারি সব চাইতে ভালো। আমার বড়দা যে দু'ভলুম ওয়েবস্টারের ডিক্সনারি কিনেছেন, তার এক-একখানা বই এত্তোখানি বড় আর এম্নি মোটা আর লাল চামড়া দিয়ে বাঁধানো।" উঁচুক্লাশের একজন ছাত্র আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া বলিল, "কি রকম লাল হে? তোমার এই কানের মতো?" তবু ভোলানাথ এমন বেহায়া, সে তার পরদিনই সেই তাহাদেরই কাছে ফুটবল সম্বন্ধে কি যেন মতামত দিতে গিয়া এক চড় খাইয়া আসিল।

বিশুদের একটা ইঁদুর ধরিবার কল ছিল। ভোলানাথ হঠাৎ একদিন "এটা কিসের কল ভাই?" বলিয়া সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া কলকব্জা এমন বিগড়াইয়া দিল যে, কলটা একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। বিশু বলিল, "না জেনে শুনে কেন টানাটানি করতে গেলি?" ভোলানাথ কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল, "আমার দোষ হল বুঝি? দেখতো হাতলটা কিরকম বিচ্ছিরি বানিয়েছে। ওটা আরও অনেক মজবুত করা উচিত ছিল। কলওয়ালা ভয়ানক ঠকিয়েছে।"

ভোলানাথ পড়াশুনায় যে খুব ভালো ছিল তাহা নয়, কিন্তু মাস্টার মহাশয় যখন কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন সে জানুক আর না জানুক সাত তাড়াতাড়ি সকলের আগে জবাব দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত। জবাবটা অনেক সময়েই বোকার মতো হইত, শুনিয়া মাস্টার মহাশয় ঠাট্টা করিতেন, ছেলেরা হাসিত; কিন্তু ভোলানাথের উৎসাহ তাহাতে কমিত না।

সেই যেবার ইস্কুলে বই চুরির হাঙ্গামা হয়, সেবারও সে এইরকম সর্দারি করিতে গিয়া খুব জব্দ হয়। হেডমাস্টার মহাশয় ক্রমাগত বই চুরির নালিশে বিরক্ত হইয়া, একদিন প্রত্যেক ক্লাশে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে চুরি করছে তোমরা কেউ কিছু জানো?" ভোলানাথের ক্লাশে এই প্রশ্ন করিবামাত্র সে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "আজ্ঞে", আমার বোধ হয় হরিদাস চুরি করে।" জবাব শুনিয়া আমরা সবাই অবাক হইয়া গেলাম। হেডমাস্টার মহাশয় বলিলেন, "কি করে জানলে যে হরিদাস চুরি করে?" ভোলানাথ অম্লানবদনে বলিল, "তা জানিনে, কিন্তু আমার মনে হয়।" মাস্টার মহাশয় ধমক দিয়া বলিলেন, "জানো না, তবে অমন কথা বললে কেন ? ও রকম মনে করবার তোমার কি কারণ আছে?" ভোলানাথ আবার বলিল, "আমার মনে হচ্ছিল, বোধহয় নেয়—তাই তো বললাম। আর তো কিছু আমি বলিনি।" মাস্টার মহাশয় গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "যাও, হরিদাসের কাছে ক্ষমা চাও।" তখনই তাহার কান ধরিয়া হরিদাসের কাছে ক্ষমা চাওয়ানো হইল। কিন্তু তবু কি তাহার চেতনা হয়?

ভোলানাথ সাঁতার জানে না, কিন্তু তবু সে বাহাদুরি করিয়া হরিশের ভাইকে সাঁতার শিখাইতে গেল। রামবাবু হঠাৎ ঘাটে আসিয়া পড়েন, তাই রক্ষা। তা না হইলে দুজনকেই সেদিন ঘোষপুকুরে ডুবিয়া মরিতে হইত। কলিকাতায় মামার নিষেধ না শুনিয়া চলতি ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া ভোলানাথ কাদার উপর যে আছাড় খাইয়াছিল, তিন মাস পর্যন্ত তাহার আঁচড়ের দাগ তাহার নাকের উপর ছিল। আর বেদেরা শেয়াল ধরিবার জন্য যেবার ফাঁদ পাতিয়া রাখে, সেবার সেই ফাঁদ ঘাঁটিতে গিয়া ভোলানাথ কি রকম আটকা পড়িয়াছিল, সেকথা ভাবিলে আজও আমাদের হাসি পায়। কিন্তু সব চাইতে যেবার সে জব্দ হইয়াছিল সেবারের কথা বলি শোনো।

আমাদের ইস্কুলে আসিতে হইলে কলেজবাড়ির পাশ দিয়া আসিতে হয়। সেখানে একটা ঘর আছে, তাহাকে বলে ল্যাবরেটরি। সেই ঘরে নানারকম অদ্ভুত কলকারখানা থাকিত। ভোলানাথের সবটাতেই বাড়াবাড়ি, সে একদিন একেবারে কলেজের ভিতর গিয়া দেখিল, একটা কলের চাকা ঘুরানো হইতেছে আর কলের একদিকে চড়াক চড়াক করিয়া বিদ্যুতের মতো ঝিলিক্

জ্বলিতেছে। দেখিয়া ভোলানাথের ভারি শখ হইল, সেও একবার কল ঘুরাইয়া দেখে ! কিন্তু কলের কাছে যাওয়া মাত্র, কে একজন তাহাকে এমন ধমক দিয়া উঠিল যে, ভয়ে এক দৌড়ে সে ইস্কুলে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। কিন্তু কলটা একবার নাড়িয়া দেখিবার ইচ্ছা তাহার কিছুতেই গেল না। একদিন বিকালে যখন সকলে বাড়ি যাইতেছি, তখন ভোলানাথ যে কোন সময়ে কলেজবাড়িতে ঢুকিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। সে চুপিচুপি কলেজ বাড়ির ল্যাবরেটরি বা যন্ত্রখানায় ঢুকিয়া অনেকক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া দেখে, ঘরে কেউ নাই। তখনই ভরসা করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে কলকব্জা দেখিতে লাগিল। সেই দিনের সেই কলটা আলমারির আড়ালে উঁচু তাকের উপর তোলা রহিয়াছে। সেখানে তাহার হাত যায় না। অনেক কষ্টে সে টেবিলের পিছন হইতে একখানা বড় চৌকি লইয়া আসিল। এদিকে কখন যে কলেজের কর্মচারী চাবি দিয়া ঘরের তালা আঁটিয়া চলিয়া গেল, সেও ভোলানাথকে দেখে নাই, ভোলানাথেরও সেদিকে চোখ নাই। চৌকির উপর দাঁড়াইয়া ভোলানাথ দেখিল কলটার কাছে একটা অদ্ভুত বোতল। সেটা যে বিদ্যুতের বোতল, ভোলানাথ তাহা জানে না। সে বোতলটাকে ধরিয়া সরাইয়া রাখিতে গেল, মনে হইল যেন তাহার হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কিসের একটা ধাক্কা লাগিল, সে মাথা ঘুরিয়া চৌকি হইতে পড়িয়া গেল।

বিদ্যুতের ধাক্কা খাইয়া ভোলানাথ খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিল। তারপর ব্যস্ত হইয়া পলাইতে গিয়া দেখে দরজা বন্ধ ! অনেকক্ষণ দরজায় ধাক্কা দিয়া, কিল ঘুঁষি লাথি মারিয়াও দরজা খুলিল না। জানালাগুলি অনেক উঁচুতে আর বাহির হইতে বন্ধ করা— চৌকিতে উঠিয়াও নাগাল পাওয়া গেল না। তাহার কপালে দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। সে ভাবিল প্রাণপণে চীৎকার করা যাক, যদি কেউ শুনিতে পায়। কিন্তু তাহার গলার স্বর এমন বিকৃত শোনাইল, আর মস্ত ঘরটাতে এমন অদ্ভুত প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল যে, নিজের আওয়াজে নিজেই সে ভয় পাইয়া গেল।

ওদিকে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কলেজের বটগাছটির উপর হইতে একটা পেঁচা হঠাৎ 'ভুত-ভুতুম-ভুত' বলিয়া বিকট শব্দে ডাকিয়া উঠিল। সেই শব্দে একেবারে দাঁতে দাঁতে লাগিয়া ভোলানাথ এক চীৎকারেই অজ্ঞান।

কলেজের দারোয়ান তখন আমাদের ইস্কুলের পাঁড়েজি আর দু-চারটি দেশ-ভাইয়ের সঙ্গে জুটিয়া মহা উৎসাহে ‘হাঁ হাঁ রে কাঁহা গয়ো রাম’ বলিয়া ঢোল কর্তাল পিটাইতেছিল, তাহারা কোনোরূপ চীৎকার শুনিতে পায় নাই। রাতদুপুর পর্যন্ত তাহাদের কীর্তনের হললা চলিল; সুতরাং জ্ঞান হইবার পর ভোলানাথ যখন দরজায় দুমদুম্ লাথি মারিয়া চেঁচাইতেছিল, তখন সে শব্দ গানের ফাঁকে ফাঁকে তাহাদের কানে একটু-আধটু আসিলেও তাহারা গ্রাহ্য করে নাই। পাঁড়েজি একবার খালি বলিয়াছিল, কিসের শব্দ একবার খোঁজ লওয়া যাক, তখন অন্যেরা বাধা দিয়া বলিয়াছিল, “আরে চিললানে দেও।” এমনি করিয়া রাত বারোটার সময় যখন তাহাদের উৎসাহ ঝিমাইয়া আসিল, তখন ভোলানাথের বাড়ির লোকেরা লণ্ঠন হাতে হাজির হইল। তাহারা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া কোথাও তাহাকে আর খুঁজিতে বাকি রাখে নাই। দারোয়ানদের জিজ্ঞাসা করায় তাহারা একবাক্যে বলিল, ‘ইস্কুল বাবুদের’ কাহাকেও তাহারা দেখে নাই। এমন সময় সেই দুমদুম শব্দ আর চীৎকার আবার শোনা গেল।

তারপর ভোলানাথের সন্ধান পাইতে আর বেশি দেরি হইল না। কিন্তু তখনও উদ্ধার নাই—দরজা বন্ধ, চাবি গোপালবাবুর কাছে, গোপালবাবু বাসায় নাই, ভাইঝির বিবাহে গিয়াছেন, সোমবার আসিবেন। তখন অগত্যা মই আনাইয়া, জানালা খুলিয়া, সার্সির কাঁচ ভাঙিয়া, অনেক হাঙ্গামার পর ভয়ে মৃতপ্রায় ভোলনাথকে বাহির করা হইল। সে ওখানে কি করিতেছিল, কেন আসিয়াছিল, কেমন করিয়া আটকা পড়িল ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহার বাবা প্রকাণ্ড এক চড় তুলিতেছিলেন, কিন্তু ভোলানাথের ফ্যাকাশে মুখখানা দেখিবার পর সে চড় আর তাহার গালে নামে নাই।

নানাজনে জেরা করিয়া তাহার কাছে যে সমস্ত কথা আদায় করিয়াছেন, তাহা শুনিয়াই আমরা তাহার আটকা পড়িবার বর্ণনাটা দিলাম। কিন্তু আমাদের কাছে এত কথা কবুল করে নাই। আমাদের সে আরও উল্টা বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, সে ইচ্ছা করিয়াই বাহাদুরির জন্যে কলেজ বাড়িতে রাত কাটাইবার চেষ্টায় ছিল। সে দেখিল যে, তাহার সে কথা কেহ বিশ্বাস করে না, বরং আসল কথাটা ক্রমেই ফাঁস হইয়া পড়িতেছে, তখন সে এমন মুষড়াইয়া

গেল যে, অন্তত মাস তিনকের জন্য তাহার সর্দারির অভ্যাসটা বেশ একটু দমিয়া পড়িয়াছিল।

চণ্ডীপুরের ইংরাজি স্কুলে আমাদের ক্লাশে একটি নূতন ছাত্র আসিয়াছে। তার বয়স বারো-চোদ্দোর বেশি নয়। সে স্কুলে আসিয়া প্রথম দিনই সকলকে জানাইল, "আমি পোইট্রি লিখতে পারি!" এ কথা শুনিয়া ক্লাশসুদ্ধ সকলে অবাক হইয়া গেল; কেবল দু-একজন হিংসা করিয়া বলিল, "আমরাও ছেলেবেলায় ঢের ঢের কবিতা লিখেছি।" নূতন ছাত্রটি বোধ হয় ভাবিয়াছিল, সে কবিতা লিখিতে পারে, শুনিয়া ক্লাশে খুব হুলুস্থূল পড়িয়া যাইবে, এবং কবিতার নমুনা শুনিবার জন্য সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিবে। যখন সেরূপ কিছুরই লক্ষণ দেখা গেল না, তখন বেচারা, যেন আপন মনে কি কথা বলিতেছে, এরূপভাবে, যাত্রার মত সুর করিয়া একটা কবিতা আওড়াইতে লাগিল-

ওহে বিহঙ্গম তুমি কিসের আশায়
বসিয়াছ উচ্চ ডালে সুন্দর বাসায়?
নীল নভোমণ্ডলেতে উড়িয়া উড়িয়া
কত সুখ পাও, আহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া!
যদ্যপি থাকিত মম পুচ্ছ এবং ডানা
উড়ে যেতাম তব সনে নাহি শুনে মানা—

কবিতা শেষ হইতে না হইতেই ভবেশ অদ্ভুত সুর করিয়া এবং মুখভঙ্গি করিয়া বলিল—

আহা যদি থাকত তোমার
ল্যাজের উপর ডানা
উড়ে গেলেই আপদ যেত—
করত না কেউ মানা!

নূতন ছাত্র তাহাতে রাগিয়া বলিল, "দেখ বাপু, নিজেরা যা পার না, তা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়া ভারি সহজ। শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলের গল্প শোন নি

বুঝি?" একজন ছেলে অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো মুখ করিয়া বলিল, "শৃগাল অবং দ্রাক্ষাফল! সে আবার কি গল্প?" অমনি নূতন ছাত্রটি আবার সুর ধরিল-

বৃক্ষ হতে দ্রাক্ষাফল ভক্ষণ করিতে
লোভী শৃগাল প্রবেশিল দ্রাক্ষাক্ষেতে
কিন্তু হায় দ্রাক্ষা যে অত্যন্ত উচ্চে থাকে
শৃগাল নাগাল পাবে কিরূপে তাহাকে?
বারম্বার চেষ্টায় হয়ে অকৃতকার্য
'দ্রাক্ষা টক' বলিয়া পালাল ছেড়ে রাজ্য।

সেই হইতে আমাদের হরেরাম একেবারে তাহার চেলা হইয়া গেল। হরেরামের কাছে আমরা শুনিলাম যে ছোকরার নাম শ্যামলাল। সে নাকি এত কবিতা লিখিয়াছে যে একখানা দু'পয়সার খাতা প্রায় ভর্তি হইয়াছে, আর আট-দশটি কবিতা হইলেই তাহার একশোটা পুরা হয়, তখন সে নাকি বই ছাপাইবে।

ইহার মধ্যে একদিন এক কাণ্ড হইল। গোপাল বলে একটি ছেলে স্কুল ছাড়িয়া যাইবে, এই উপলক্ষে শ্যামলাল এক প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল! তাহার মধ্যে 'বিদায় বিদায়' বলিয়া অনেক 'অশ্রুজল' 'দুঃখশোক' ইত্যাদি কথা ছিল। গোপাল কবিতার আধখানা শুনিয়াই একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "হতভাগা, ফের আমার নামে পোইট্রি লিখবি তো এক থাপ্পড় মারব। কেন রে বাপু দুনিয়ায় কি কবিতা লিখবার আর কোনো জিনিস পাও নি?" হরেরাম বলিল, "আহা, বুঝলে না? তুমি ইস্কুল ছেড়ে যাচ্ছ কিনা, তাই ও লিখেছে।" গোপাল বলিল, "ছেড়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছি, তোর তাতে কি রে? ফের জ্যাঠামি করবি তো তোর কবিতার খাতা ছিঁড়ে দেব।"

দেখিতে দেখিতে স্কুলময় রাষ্ট্র হয়ে পড়িল। তাহার দেখাদেখি আরও অনেকেই কবিতা লিখিতে শুরু করিল। ক্রমে কবিতা লেখার বাতিকটা ভয়ানক রকমের ছোঁয়াচে হইয়া নিচের ক্লাশে প্রায় অর্ধেক ছেলেকে পাইয়া

বসিল। ছোট ছোট ছেলেদের পকেটে ছোট ছোট কবিতার খাতা দেখা দিল। বড়োদের মধ্যে কেহ কেহ শ্যামলালের চেয়ে ভালো কবিতা লিখিতে পারে বলিয়া শোনা যাইতে লাগিল। স্কুলের দেয়ালে, পড়ার কেতাবে, পরীক্ষার খাতায়, চারিদিকে কবিতা গজাইয়া উঠিল।

পাঁড়েজির বৃদ্ধ ছাগল যেদিন শিং নাড়িয়া দড়ি ছিঁড়িয়া স্কুলের উঠানে দাপাদাপি করিয়াছিল, আর শ্যামলালকে তাড়া করিয়া খানায় ফেলিয়াছিল, তাহার পরদিন ভারতবর্ষের বড়ো ম্যাপের উপর বড়ো-বড়ো অক্ষরে লেখা বাহির হইল-

পাঁড়েজির ছাগলের একহাত দাড়ি,
অপরূপ রূপ তার যাই বলিহারি!
উঠানে দাপটি করি নেচেছিল কাল,
তার পর কি হইল জানে শ্যামলাল।

শ্যামলালের রঙটি কালো, কিন্তু কবিতা পড়িয়া সে যথার্থই চটিয়া লাল হইল, এবং তখনই তাহার নীচে একটা কড়া জবাব লিখিতে লাগিল। সে সবেমাত্র লিখিয়াছে— 'রে অধম কাপুরুষ, পাষণ্ড বর্বর!'—এমন সময় গুরু গম্ভীর গলা শোনা গেল—''ম্যাপের ওপর কি লেখা হচ্ছে?'' ফিরিয়া দেখে হেডমাস্টার মহাশয়! শ্যামলাল একেবারে থতমত খাইয়া বলিল, "আজ্ঞে স্যার, আগে ওরা লিখেছিল।" "ওরা কারা?" শ্যামলাল বোকার মত একবার আমাদের দিকে একবার কড়িকাঠের দিকে তাকাইতে লাগিল, কাহার নাম করিবে বুঝিতে পারিল না। মাস্টার- মহাশয় আবার বলিলেন, "ওরা যদি পরের বাড়ি সিঁদ কাটতে যায়, তুমিও কাটবে?" যাহা হউক, সেদিন অল্পের উপর দিয়াই গেল, শ্যামলাল একটু ধমক-ধামক খাইয়াই খালাস পাইল।

ইহার মধ্যে একদিন আমাদের পণ্ডিত মহাশয় গল্প করিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে যাহারা এক ক্লাশে পড়িত, তাহাদের মধ্যে একজন নাকি অতি সুন্দর কবিতা লিখিত। একবার ইনস্পেকটার স্কুল দেখিতে আসিয়া তাহার কবিতা

শুনিয়া এমন খুশি হইয়াছিল যে, তাহাকে একটা সুন্দর ছবিওয়ালা বই উপহার দিয়াছিলেন।

ইহার মাসখানেক পরেই ইনস্পেকটার ইস্কুল দেখিতে আসিলেন। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি ছেলে সাবধানে পকেটের মধ্যে লুকাইয়া কবিতার কাগজ আনিয়াছে। বড়ো হলের মধ্যে সমস্ত স্কুলর ছেলেদের দাঁড় করানো হইয়াছে, হেডমাস্টার মহাশয় ইনস্পেকটারকে লইয়া ঘরে ঢুকিতেছেন—এমন সময় শ্যামলাল আস্তে আস্তে পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিল। আর কোথা যায়! পাছে, শ্যামলাল আগেই তাহার কবিতা পড়িয়া ফেলে, এই ভয়ে ছোট বড় একদল কবিতাওয়ালা একসঙ্গে নানাসুরে চিৎকার করিয়া যে যার কবিতা হাঁকিয়া উঠিল। মনে হইল, সমস্ত বাড়িটা কর্তালের মতো ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল- ইনস্পেকটার মহাশয় মাথা ঘুরিয়া মাঝপথেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন। ছাদের উপর একটা বেড়াল ঘুমাইতেছিল সেটা হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়িয়া তিনতলা হইতে পড়িয়া গেল, স্কুলের দারোয়ান হইতে অফিসের কেশিয়ার বাবু পর্যন্ত হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল!

সকলে সুস্থ হইলে পর মাস্টার মহাশয় বলিলেন, “এত চেঁচালে কেন?” সকলে চুপ করিয়া রহিল। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, “কে কে চেঁচাইয়াছিল?” পাঁচ-সাতটি ছেলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—”শ্যামলাল।”

শ্যামলাল যে একা অত মারাত্মক রকম চেঁচাইতে পারে এ কথা কেহই বিশ্বাস করিল না। যতগুলি ছেলের পকেটে কবিতার খাতা পাওয়া গেল, স্কুলের পর তাহাদের দেড়ঘন্টা আটকাইয়া রাখা হইল!

অনেক তম্বিতাম্বার পর একে একে সমস্ত কথা বাহির হইয়া পড়িল। তখন হেডমাস্টার মহাশয় বলিলেন, “কবিতা লেখার রোগ হয়েছে? ও রোগের ওষুধ কি?” বৃদ্ধ পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, “বিষস্য বিষমৌষধম্- বিষের ওষুধ বিষ। বসন্তের ওষুধ যেমন বসন্তের টিকা, কবিতার ওষুধ তস্য টিকা। তোমরা যে যা কবিতা লিখেছ, তার টিকা করে দিচ্ছি। তোমরা একমাস প্রতিদিন

পঞ্চাশবার করে এটা লিখে এনে স্কুলে আমায় দেখাবে।" এই বলে তিনি টিকা দিলেন—

পদে পদে মিল খুঁজে, গুনে দেখি চৌদ্দ
এই দেখ লিখে দিনু কি ভীষণ পদ্য!
এক চোটে এইবারে উড়ে গেল সবি তা,
কবিতার গুঁতো মেরে গিলে ফেলি কবিতা।

একমাস তিনি কবিদের কাছে এই লেখা প্রতিদিন পঞ্চাশবার আদায় না করিয়া ছাড়িলেন না। এ কবিতার কি আশ্চর্য গুণ তারপর হইতে কবিতা লেখার ফ্যাশান স্কুল হইতে একেবারেই উঠিয়া গেল।

নন্দলালের ভারি রাগ, অঙ্কের পরীক্ষায় মাস্টার তাহাকে গোল্লা দিয়াছেন। সে যে খুব ভালো লিখিয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু তা বলিয়া একেবারে গোল্লা দেওয়া কি উচিত ছিল ? হাজার হোক সে একখানা পুরা খাতা লিখিয়াছিল তো! তার পরিশ্রমের কি কোনো মূল্য নাই ? ঐ যে ত্রৈরাশিকের অঙ্কটা, সেটা তো তার প্রায় ঠিকই হইয়াছিল, কেবল একটুখানি হিসেবের ভুল হওয়াতে উত্তরটা ঠিক মেলে নাই। আর ঐ যে একটা ডেসিমাল্ অঙ্ক ছিল, সেটাতে গুণ করিতে গিয়া সে ভাগ করিয়া বসিয়াছিল, তাই বলিয়া কি একটা নম্বরও দিতে নাই ? আরও অন্যায় এই যে, কথাটা মাস্টার মহাশয় ক্লাসের ছেলেদের কাছে ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছেন কেন? আর একবার হরিদাস যখন গোল্লা পাইয়াছিল, তখন তো সে কথাটা রাষ্ট্র হয় নাই!

সে যে ইতিহাসে একশোর মধ্যে পঁচিশ পাইয়াছে, সেটা বুঝি কিছু নয়? খালি অঙ্ক ভালো পারে নাই বলিয়াই তাহাকে লজ্জিত হইতে হইবে? সব বিষয়ে যে সকলকে ভালো পারিতে হইবে, তাহারই বা অর্থ কি? স্বয়ং নেপোলিয়ান যে ছেলেবেলোয় ব্যাকরণে একেবারে আনাড়ী ছিলেন, সে বেলা কি? তাহার এই যুক্তিতে ছেলেরা দমিল না, এবং মাস্টারদের কাছে এই তর্কটা তোলাতে তাঁহারাও যে যুক্তিটাকে খুব চমৎকার ভাবিলেন, এমন তো বোধ হইল না। তখন নন্দলাল বলিল, তাহার কপালই মন্দ—ও নাকি বরাবর তাহা দেখিয়া আসিতেছে।

সেই তো যেবার ছুটির আগে তাহাদের পাড়ায় হাম দেখা দিয়াছিল, তখন বাড়িসুদ্ধ সকলেই হামে ভুগিয়া দিব্যি মজা করিয়া স্কুল কামাই করিল, কেবল বেচারা নন্দলালকেই নিয়মমতো প্রতিদিন স্কুলে হাজিরা দিতে হইয়াছিল। তারপর যেমন ছুটি আরম্ভ হইল, অমনি তাহাকে জ্বরে আর হামে ধরিল—ছুটির অর্ধেকটাই মাটি! সেই যেবার সে মামার বাড়ি গিয়াছিল, সেবার তাহার মামাতো ভাইয়েরা কেহ বাড়ি ছিল না—ছিলেন কোথাকার এক বদমেজাজি মেশো, তিনি উঠিতে বসিতে কেবল ধমক আর শাসন ছাড়া আর কিছু জানিতেন না। তাহার উপর সেবার এমন বৃষ্টি হইয়াছিল, একদিনও

ভালো করিয়া খেলা জমিল না, কোথাও বেড়ানো গেল না ! সেই জন্য পরের বছর যখন আর সকলে মামার বাড়ি গেল, তখন সে কিছুতেই যাইতে চাহিল না। পরে শুনিল সেবার নাকি সেখানে চমৎকার মেলা বসিয়াছিল, কোন রাজার দলের সঙ্গে পঁচিশটি হাতি আসিয়াছিল, আর বাজি যা পোড়ানো হইয়াছিল সে একেবারে আশ্চর্য রকম! নন্দলালের ছোট ভাই যখন বার বার উৎসাহ করিয়া তাহার কাছে এই সকলের বর্ণনা করিতে লাগিল, তখন নন্দ তাহাকে এক চড় মারিয়া বলিল, "যা যা! মেলা বকবক করিসনে।" তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল, সেবার সে মামার বাড়ি গিয়াও ঠকিল, এবার না গিয়াও ঠকিল! তাহার মতো কপাল-মন্দ আর কেহ নাই।

স্কুলেও ঠিক তাই। সে অঙ্ক পারে না—অথচ অঙ্কের জন্য দুই-একটা প্রাইজ আছে—এদিকে ভুগোল ইতিহাস তাহার কণ্ঠস্থ, কিন্তু ঐ দুইটার একটাতেও প্রাইজ নাই। অবশ্য সংস্কৃতিতেও সে নেহাত কাঁচা নয়, ধাতু প্রত্যয় বিভক্তি সব চটপট মুখস্থ করিয়া ফেলে—চেষ্টা করিলে কি পড়ার বই আর অর্থ-পুস্তকটাকে সড়গড় করিতে পারে না ? ক্লাশের মধ্যে খুদিরাম একটু-আধটু সংস্কৃত জানে—কিন্তু তাহা তো বেশি নয়। নন্দলাল ইচ্ছা করিলে কি তাহাকে হারাইতে পারে না? নন্দ জেদ করিয়া স্থির করিল, 'একবার খুদিরামকে দেখে নেব। ছোকরা এ বছর সংস্কৃতের প্রাইজ পেয়ে ভারি দেমাক করছে—আবার অঙ্কের গোল্লার জন্য আমাকে খোঁটা দিতে এসেছিল। আচ্ছা, এবার দেখা যাবে।'

নন্দলাল কাহাকেও না জানাইয়া সেইদিন হইতেই বাড়িতে ভয়ানক ভাবে পড়িতে শুরু করিল। ভোরে উঠিয়াই সে 'হসতি হসত হসন্তি' শুরু করে, রাত্রেও 'অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শল্মলীতরু' বলিয়া ঢুলিতে থাকে। কিন্তু ক্লাশের ছেলেরা এ কথার বিন্দুবিসর্গও জানে না। পণ্ডিত মহাশয় যখন ক্লাশে প্রশ্ন করেন, তখন মাঝে মাঝে উত্তর জানিয়াও সে চুপ করিয়া মাথা চুলকাইতে থাকে, এমন কি কখনো ইচ্ছা করিয়া দু-একটা ভুল বলে, পাছে খুদিরাম তার পড়ার খবর টের পাইয়া আরও বেশি করিয়া পড়ায় মন দিতে থাকে। তাহার ভুল উত্তর শুনিয়া খুদিরাম মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে, নন্দলাল তাহার কোনো জবাব দেয় না, কেবল খুদিরাম নিজে যখন এক-একটা ভুল

করে, তখন সে মুচকি মুচকি হাসে, আর ভাবে, 'পরীক্ষার সময় অম্নি ভুল করলেই এবার ওঁকে সংস্কৃতের প্রাইজ পেতে হবে না।'

ওদিকে ইতিহাসের ক্লাশে নন্দলালের প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল। কারণ, ইতিহাস আর ভুগোল নাকি এক রকম শিখিলেই পাশ করা যায়—তাহার জন্য নন্দর কোনো ভাবনা নাই। তাহার সমস্ত মনটা রহিয়াছে ঐ সংস্কৃত পড়ার উপরে—অর্থাৎ সংস্কৃত প্রাইজটার উপরে! একদিন মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "কি হে নন্দলাল, আজকাল বুঝি বাড়িতে কিছু পড়াশুনা কর না? সব বিষয়েই যে তোমার এমন দুর্দশা হচ্ছে, তার অর্থ কি?" নন্দ আর একটু হইলেই বলিয়া ফেলিত 'আজ্ঞে সংস্কৃত পড়ি', কিন্তু কথাটাকে হঠাৎ সামলাইয়া "আজ্ঞে সংস্কৃত—না সংস্কৃত নয়" বলিয়াই সে খতমত খাইয়া গেল। খুদিরাম তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কৈ! সংস্কৃতও তো কিছু পারে না।" শুনিয়া ক্লাশসুদ্ধ ছেলে হাসিতে লাগিল। নন্দ একটু অপ্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল—ভাগ্যিস তাহার সংস্কৃত পড়ার কথাটা ফাঁস হইয়া যায় নাই।

দেখিতে দেখিতে বছর কাটিয়া আসিল, পরীক্ষার সময় প্রায় উপস্থিত। সকলে পড়ার কথা, পরিক্ষার কথা আর প্রাইজের কথা বলাবলি করিতেছে, এমন সময় একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে ! নন্দ এবার কোন্ প্রাইজটা নিচ্ছ?" খুদিরাম নন্দর মতো গলা করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'আজ্ঞে সংস্কৃত, না সংস্কৃত নয়।" সকলে হাসিল, নন্দও খুব উৎসাহ করিয়া সে হাসিতে যোগ দিল। মনে মনে ভাবিল, 'বাছাধন, এ হাসি আর তোমার মুখে বেশি দিন থাকছে না।'

যথাসময়ে পরীক্ষা আরম্ভ হইল এবং যথাসময়ে শেষ হইল। পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য সকলে আগ্রহ করিয়া আছে, নন্দও রোজ নোটিশবোর্ডে গিয়া দেখে, তাহার নামে সংস্কৃত প্রাইজ পাওয়ার কোনো বিজ্ঞাপন আছে কিনা। তারপর একদিন হেডমাস্টার মহাশয় এক তাড়া কাগজ লইয়া ক্লাশে আসিলেন, আসিয়াই তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এবার দু-একটা নতুন প্রাইজ হয়েছে আর অন্য বিষয়েও কোনো কোনো পরিবর্তন হয়েছে।" এই

বলিয়া তিনি পরীক্ষার ফলাফল পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে দেখা গেল ইতিহাসের জন্য কে যেন একটা রূপার মেডেল দিয়াছেন। খুদিরাম ইতিহাসে প্রথম হইয়াছে, সে-ই ঐ মেডেলটা লইবে। সংস্কৃতে নন্দ প্রথম, খুদিরাম দ্বিতীয়—কিন্তু এবার সংস্কৃতে কোনো প্রাইজ নাই।

হায় হায়! নন্দর অবস্থা তখন শোচনীয়! তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সে ছুটিয়া গিয়া খুদিরামকে কয়েকটা ঘুঁষি লাগাইয়া দেয়। কে জানিত এবার ইতিহাসের জন্য প্রাইজ থাকিবে, আর সংস্কৃতের জন্য থাকিবে না। ইতিহাসের মেডেলটা তো সে অনায়াসেই পাইতে পারিত। কিন্তু তাহার মনের কষ্ট কেহ বুঝিল না—সবাই বলিল, "বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে— কেমন করে ফাঁকি দিয়ে নম্বর পেয়েছে।" দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া নন্দ বলিল, "কপাল মন্দ!"

আগে যিনি আমাদের পণ্ডিত ছিলেন, তিনি লোক বড় ভালো। মাঝে মাঝে আমাদের ধমক –ধামক না করিতেন তাহা নয়, কিন্তু কখনও কাহাকেও অন্যায় শাস্তি দেন নাই। এমন কি ক্লাশে আমরা কত সময় গোল করিতাম, তিনি মাঝে মাঝে 'আঃ' বলিয়া ধমক দিতেন। তাঁর হাতে একটা ছড়ি থাকিত, খুব বেশি রাগ করিলেই সেই ছড়িটাকে টেবিলের উপর আছড়াইতেন—সেটাকে কোনো দিন কাহারও পিঠে পড়িতে দেখি নাই। তাই আমরা কেউ তাঁহাকে মানিতাম না।

আমাদের হেডমাস্টার মশাইটি দেখিতে তাঁর চাইতেও নিরীহ ভালোমানুষ। ছোট্ট বেঁটে মানুষটি, গোঁফ দাড়ি কামানো, গোলগালমুখ, তাহাতে সর্বদাই যেন হাসি লাগিয়াই আছে। কিন্তু চেহারায় কি হয় ? তিনি যদি 'শ্যামচারণ কার নাম?' বলিয়া ক্লাশে আসিয়াই আমায় ডাক দিতেন, তবে তাঁর গলার আওয়াজেই আমার হাত পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইত। তাঁর হাতে কোনো দিন বেত দেখি নাই, কারণ বেতের কোনো দরকার হইত না—তাঁর হুঙ্কারটি যার উপর পড়িত সেই চক্ষে অন্ধকার দেখিত।

একদিন পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, "সোমবার থেকে আমি আর পড়াতে আসব না—কিছু দিনের ছুটি নিয়েছি। আমার জায়গায় আর একজন আসবেন। দেখিস তাঁর ক্লাশে তোরা যেন গোল করিসনে।" শুনিয়া আমাদের ভারি উৎসাহ লাগিল; তারপর যে কয়দিন পণ্ডিতমহাশয় স্কুলে ছিলেন, আমরা ক্লাশে এক মিনিটও পড়ি নাই। একদিন বেহারীলাল পড়ার সময় পড়িয়াছিল, সেজন্য আমরা পরে চাঁদা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিয়াছিলাম। যাহা হউক, পণ্ডিত মহাশয় সোমবার আর আসিলেন না—তাঁর বদলে যিনি আসিলেন, তাঁর গোল কালো চশমা, মুখভরা গোঁফের জঙ্গল আর বাঘের মতো আওয়াজ শুনিয়া আমাদের উৎসাহ দমিয়া গেল। তিনি ক্লাশে আসিয়াই বলিলেন, "পড়ার সময় কথা বলবে না, হাসবে না, যা বলব তাই করবে। রোজকার পড়া রোজ করবে। আর যদি তা না কর, তা হলে তুলে আছাড় দেব।" শুনিয়া আমাদের তো চক্ষু স্থির!

ফকিরচাঁদের তখন অসুখ ছিল, সে বেচারা কদিন পরে ক্লাশে আসিতেই নূতন পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন। ফকির থতমত খাইয়া ভয়ে আস্তা করিয়া বলিল, ''আজ্ঞে-আমি ইস্কুলে আসিনি—'' পণ্ডিত মহাশয় রাগিয়া বলিলেন, ''ইস্কুলে আসনি তো কোথায় এসেছ? তোমার মামার বাড়ি?'' বেচারা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, ''সাতদিন ইস্কুলে আসিনি, কি করে পড়া বলব?'' পণ্ডিতমহাশয় ''চোপরাও বেয়াদব—মুখের উপর মুখ'' বলিয়া এমন ভয়ানক গর্জন করিয়া উঠিলেন যে ভয়ে ক্লাশ সুদ্ধ ছেলের মুখের তালু শুকাইয়া গেল।

আমাদের হরিপ্রসন্ন অতি ভালো ছেলে। সে একদিন ইস্কুলের অফিসে গিয়া খবর পাইল—সে নাকি এবার কি একটা প্রাইজ পাইবে। খবরটা শুনিয়া বেচারা ভারি খুশি হইয়া ক্লাশে আসিতেছিল, এমন সময় নূতন পণ্ডিত মহাশয় ''হাসছ কেন'' বলিয়া হঠাৎ এমন ধমক দিয়া উঠিলেন যে মুখের হাসি এক মুহূর্তে আকাশে উড়িয়া গেল। তাহার পরদিন আমাদের ক্লাশের বাহিরে রাস্তার ধারে কে যেন হো হো করিয়া হাসিতেছিল, শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় পাশের ঘর হইতে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া আর কথাবার্তা নাই—''কেবল হাসি?'' বলিয়া হরিপ্রসন্নর গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া কয়েক চড় লাগাইয়া, আবার হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই অবধি হরিপ্রসন্নর উপর তিনি বিনা কারণে যখন তখন খাপ্পা হইয়া উঠিতেন। দেখিতে দেখিতে ইস্কুল সুদ্ধ ছেলে নূতন পণ্ডিতের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল।

একদিন আমাদের অঙ্কের মাস্টার আসেন নাই, হেডমাস্টার রামবাবু বলিয়া গেলেন—তোমরা ক্লাসে বসিয়া পুরাতন পড়া পড়িতে থাক। আমরা পড়িতে লাগিলাম, কিন্তু খানিক বাদেই পণ্ডিত মহাশয় পাশের ঘর হইতে ''পড়ছ না কেন?'' বলিয়া টেবিলে প্রকাণ্ড এক ঘুঁষি মারিলেন। আমরা বলিলাম, ''আজ্ঞে হ্যাঁ, পড়ছি তো।'' তিনি আবার বলিলেন, ''তবে শুনতে পাচ্ছি না কেন, চেঁচিয়ে পড়।'' যেই বলা অমনি বোকা ফকিরচাঁদ

'অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড—'

বলিয়া এমন চেঁচাইয়া উঠিল যে, পণ্ডিত মহাশয়ের চোখ হইতে চশমাটা পড়িয়া গেল। মাস্টার মহাশয় গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন, তারপর কেন জানি না হরিপ্রসন্নর কানে ধরিয়া তাহাকে সমস্ত স্কুলে ঘুরাইয়া আনিলেন, তাহাকে তিনদিন ক্লাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে হুকুম দিলেন, একটাকা জরিমানা করিলেন, তাহার কালো কোটের পিঠে খড়ি দিয়া 'বাঁদর' লিখিয়া দিলেন, আর ইস্কুল হইতে তাড়াইয়া দিবেন বলিয়া শাসাইয়া রাখিলেন।

পরদিন রামবাবু হরিপ্রসন্নকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং তার কাছে সমস্ত কথা শুনিয়া আমাদের ক্লাশে খোঁজ করিতে আসিলেন। তখন ফকিরচাঁদ বলিল, ''আজ্ঞে হরে চেঁচায়নি, আমি চেঁচিয়েছি।'' রামবাবু বলিলেন, ''পণ্ডিতমশাইকে পাতকী বলিয়া কি গালাগালি করিয়াছিলে?'' ফকির বলিল, ''পণ্ডিতমশাইকে কিছুই বলিনি, আমি পড়ছিলাম—

'অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড—'

এই সময় নূতন পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বোধ হয় শেষ কথাটুকু শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন তাঁহাকে লইয়া কিছু একটা ঠাট্টা করা হইয়াছে। তিনি রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া হাঁ হাঁ করিয়া ক্লাশের মধ্যে আসিয়া রামবাবুর কালো কোট দেখিয়াই ''তবে রে হরিপ্রসন্ন'' বলিয়া হেডমাস্টার মহাশয়কে পিটাইতে লাগিলেন। আমরা ভয়ে কাঠ হইয়া রহিলাম। হেডমাস্টার মহাশয় অনেক কষ্টে পণ্ডিতের হাত ছাড়াইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন যদি পণ্ডিতের মুখ দেখিতে! চেহারা ভয়ে একেবারে জুজু! তিন-চারবার হাঁ করিয়া আবার মুখ বুজিলেন, তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া এক দৌড়ে সেই যে ইস্কুল হইতে পালাইয়া গেলেন, আর কোনো দিন তাঁকে ইস্কুলে আসিতে দেখি নাই।

দুইদিন পরে পুরাতন পণ্ডিত মহাশয় আবার ফিরিয়া আসিলেন। তাঁর মুখ দেখিয়া আমাদের যেন ধড়ে প্রাণ আসিল, আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সকলে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর তাঁর ক্লাশে গোলমাল করিব না, যতই পড়া দিন না কেন, খুব ভালো করিয়া পড়িব।

"এই দ্যাখ টেঁপি, দ্যাখ,—কি রকম করে হাউই ছাড়তে হয়। বড় যে রাজুমামাকে ডাকতে চাচ্ছিলি? কেন, রাজুমামা না হলে বুঝি হাউই ছোটানো যায় না? এই দ্যাখ।"

দাদার বয়স প্রায় বছর দশেক হবে, টেঁপির বয়স মোটে আট, অন্য অন্য ভাইবোনেরা আরও ছোট। সুতরাং দাদার দাদাগিরির আর অন্ত নেই ! দাদাকে হাউই ছাড়তে দেখে টেঁপির বেশ একটু ভয় হয়েছিল, পাছে দাদা হাউইয়ের তেজে উড়ে যায়, কি পুড়ে যায়, কিম্বা সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটে যায়। কিন্তু দাদার ভরসা দেখে তারও একটু ভরসা হল।

দাদা হাউইটিকে হাতে নিয়ে, একটুখানি বাঁকিয়ে ধরে বিজ্ঞের মতো বলতে লাগল, "এই সলতের মতো দেখছিস, এইখানে আগুন ধরাতে হয়। সলতেটা জ্বলতে জ্বলতে যেই হাউই ভস্ ভস্ করে ওঠে অমনি ঠিক সময়টি বুঝে—এই এম্নি করে হাউইটিকে ছেড়ে দিতে হয়। এইখানেই হচ্ছে আসল বাহাদুরি। কাল দেখলি তো, প্রকাশটা কি রকম আনাড়ীর মতো করছিল। হাউই জ্বলতে না জ্বলতে ফস করে ছেড়ে দিচ্ছিল। সেইজন্যই হাউইগুলো আকাশের দিকে না উঠে নিচু হয়ে এদিক সেদিক বেঁকে যাচ্ছিল।"

এই বলে সবজান্তা দাদা একটি দেশলাইয়ের কাঠি ধরালেন। ভাইবোনেরা অবাক হয়ে হাঁ করে দেখতে লাগল। দেশলাইয়ের আগুনটি সলতের কাছে নিয়ে দাদা ঘাড় বাঁকিয়ে, মুচকি হেসে আর একবার টেঁপিদের দিকে তাকালেন। ভাবখানা এই যে, আমি থাকতে রাজুমামা-ফাজুমামার দরকার কি ?

ফ্যাঁস্—ফোঁস্—ছররর! এত শিগগির যে হাউইয়ে আগুন ধরে যায় সেটা দাদার খেয়ালেই ছিল না, দাদা তখনো ঘাড় বাঁকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে নিজের বাহাদুরির কথা ভাবছেন। কিন্তু হাসিটি না ফুরাতেই হাউই যখন ফ্যাঁস্ করে উঠল তখন সেই সঙ্গে দাদার মুখ থেকেও হাঁউ-মাউ গোছের

একটা বিকট শব্দ আপনা থেকেই বেরিয়ে এল। আর তার পরেই দাদা যে একটা লম্ফ দিলেন, তার ফলে দেখা গেল যে ছাতের মাঝখানে চিৎপাত হয়ে অত্যন্ত আনাড়ীর মতো হাত পা ছুঁড়ছেন। কিন্তু তা দেখবার অবসর টেঁপিদের হয়নি। কারণ দাদার-চীৎকার আর লম্ফভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে তারাও কান্নার সুর চড়িয়ে বাড়ির ভিতরদিকে রওনা হয়েছিল।

কান্না-টান্না থামলে পর রাজুমামা যখন দাদার কান ধরে তাকে ভিতরে নিয়ে এলেন, তখন দেখা গেল, দাদার হাতের কাছে ফোস্কা পড়ে গেছে আর গায়ের দু-তিন জায়গায় পোড়ার দাগ লেগেছে। কিন্তু তার জন্য দাদার তত দুঃখ নেই, তার আসল দুঃখ এই যে, টেঁপির কাছে তার বিদ্যেটা এমন অন্যায়ভাবে ফাঁস হয়ে গেল। রাজুমামা চলে যেতেই সে হাতে মলম মাখাতে মাখাতে বলতে লাগল, কোথাকার কোন দোকান থেকে হাউই কিনে এনেছ—ভালো করে মশলা মেশাতেও জানে না। বিষ্টু পাঠকের দোকান থেকে হাউই আনলেই হত। বার বার বলেছি—রাজুমামা হাউই চেনে না, তবু তাকেই দেবে হাউই কিনতে!

তারপর সে টেঁপিকে আর ভোলা, ময়না আর খুকনুকে বেশ করে বুঝিয়ে দিল যে, সে যে চেঁচিয়েছিল আর লাফ দিয়েছিল, সেটা ভয়ে নয়, হঠাৎ ফুর্তির চোটে!

যতীনের নতুন জুতো কিনে এনে তার বাবা বললেন, “এবার যদি অমন করে জুতো নষ্ট কর, তবে ওই ছেঁড়া জুতোই পরে থাকবে।”

যতীনের চটি লাগে প্রতিমাসে একজোড়া। ধুতি তার দুদিন যেতে না যেতেই ছিঁড়ে যায়। কোনো জিনিসে তার যত্ন নেই। বইগুলো সব মলাট ছেঁড়া, কোণ দুমড়ান, শ্লেটটা উপর থেকে নিচে পর্যন্ত ফাটা। শ্লেটের পেনসিলগুলি সর্বদাই তার হাত থেকে পড়ে যায়, কাজেই ছোট ছোট টুকরো টুকরো। আরেকটা তার মন্দ অভ্যাস ছিল লেড পেন্সিলের গোড়া চিবানো। চিবিয়ে চিবিয়ে তার পেন্সিলের কাঠটা বাদামের খোলার মতো খেয়ে গিয়েছিল। তাই দেখে ক্লাশের মাস্টার মশাই বলতেন, “তুমি কি বাড়িতে ভাত খেতে পাও না?”

নতুন চটি পায়ে দিয়ে প্রথম দিন যতীন খুব সাবধানে রইল, পাছে ছিঁড়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নামে, চৌকাঠ ডিঙোবার সময় সাবধানে থাকে, যাতে না ঠোক্কর খায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। দুদিন পরে আবার যেই সেই। চটির মায়া ছেড়ে দুড়্ দুড়্ করে সিঁড়ি নামা, যেতে যেতে দশবার হোঁচট খাওয়া, সব আরম্ভ হল। কাজেই এক মাস যেতে না যেতে চটির একটা পাশ একটু হাঁ করল। মা বললেন, “ওরে, এই বেলা মুচি ডেকে সেলাই করা, না হলে একেবারে যাবে।” কিন্তু মুচি ডাকা হয় না। চটির হাঁ-ও বেড়ে চলে।

একটি জিনিসের যতীন খুব যত্ন করত! সেটি হচ্ছে তার ঘুড়ি। যে ঘুড়িটা তার মনে লাগত সেটিকে সে সযত্নে জোড়াতাড়া দিয়ে যতদিন সম্ভব টিকিয়ে রাখত। খেলার সময়টা সে প্রায় ঘুড়ি উড়িয়েই কাটিয়ে দিত। এই ঘুড়ির জন্য কত সময়ে তাকে তাড়া খেতে হত। ঘুড়ি ছিঁড়ে গেলে সে রান্নাঘরে গিয়ে উৎপাত করত তার আঠা চাই বলে। গুড়ির লেজ লাগাতে কিংবা সুতো কাটতে কাঁটি দরকার হলে সে মায়ের সেলাইয়ের বাক্স ঘেঁটে রেখে দিত। ঘুড়ি উড়াতে আরম্ভ করলে তার খাওয়া-দাওয়া মনে থাকত না। সেদিন যতীন ইস্কুল থেকে বাড়িতে ফিরছে ভয়ে ভয়ে। গাছে চড়তে গিয়ে তার নতুন কাপড়খানা

অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। বই রেখে চটি পায়ে দিতে গিয়ে দেখে চটিটা এত ছিঁড়ে গেছে যে আর পরাই মুশকিল। কিন্তু সিঁড়ি নামবার সময় তার সে কথা মনে রইল না, সে দু-তিন সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে নামতে লাগল। শেষকালে চটির হাঁ বেড়ে বেড়ে, সমস্ত দাঁত বের করে ভেংচাতে লাগল! যেমনি সে শেষ তিনটা সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে পড়ছে, অমনি মাটিটা তার পায়ের নিচে থেকে সুড়ুৎ করে সরে গেল, আর ছেঁড়া চটি তাকে নিয়ে সাঁই সাঁই করে শূন্যের উপর দিয়ে কোথায় যে ছুটে চলল তার ঠিকঠিকানা নেই।

ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে চটি যখন থামল, তখন দেখল সে কোন অচেনা দেশে এসে পড়েছে। সেখানে চারদিকে অনেক মুচি বসে আছে। তারা যতীনকে দেখে কাছে এল, তারপর তার পা থেকে ছেঁড়া চটিজোড়া খুলে নিয়ে সেগুলোকে যত্ন করে ঝাড়তে লাগল। তাদের মধ্যে একজন মাতব্বর গোছের, সে যতীনকে বলল, "তুমি দেখছি ভারি দুষ্টু। জুতো জোড়ার এমন দশা করেছ? দেখ দেখি, আর একটু হলে বেচারিদের প্রাণ বেরিয়ে যেত।" যতীনের ততক্ষণে একটু সাহস হয়েছে। সে বলল, "জুতোর আবার প্রাণ থাকে নাকি?" মুচিরা বলল, "তা না তো কি ? তোমরা বুঝি মনে কর, তোমরা যখন জুতো পায়ে দিয়ে জোরে ছোটো, তখন ওদের লাগে না ? খুব লাগে। লাগে বলেই তো ওরা মচ্ মচ্ করে। যখন তুমি চটি পায়ে দিয়ে দুড়্ দুড়্ করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করেছিলে আর তোমার পায়ের চাপে ওর পাশ কেটে গিয়েছিল, তখন কি ওর লাগেনি? খুব লেগেছিল। সেইজন্যেই ও তোমাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে। যত রাজ্যের ছেলেদের জিনিসপত্রের ভার আমাদের উপর। তারা সে সবের অযত্ন করলে আমরা তাদের শিক্ষা দিই।" মুচি যতীনের হাতে ছেঁড়া চটি দিয়ে বলল, "নাও, সেলাই কর।" যতীন রেগে বলল, "আমি জুতো সেলাই করি না, মুচিরা করে।" মুচি একটু হেসে বলল, "একি তোমাদের দেশ পেয়েছ যে করব না বললেই হল? এই ছুঁচ সুতো নাও, সেলাই কর।" যতীনের রাগ তখন কমে এসেছে, তার মনে ভয় হয়েছে। সে বলল, "আমি জুতো সেলাই করতে জানি না।" মুচি বলল, "আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, সেলাই তোমাকে করতেই হবে।" যতীন ভয়ে ভয়ে জুতো সেলাই করতে বসল। তার হাতে ছুঁচ ফুটে গেল, ঘাড় নিচু করে থেকে থেকে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল, অনেক কষ্টে সারাদিনে একপাটি চটি সেলাই

হল। তখন সে মুচিকে বলল, কাল অন্যটা করব। এখন খিদে পেয়েছে।” মুচি বলল, “সে কি! সব কাজ শেষ না করে তুমি খেতেও পাবে না, ঘুমোতেও পাবে না। একপাটি চটি এখনও বাকি আছে। তারপর তোমাকে আস্তে আস্তে চলতে শিখতে হবে, যেন আর কোনো জুতার উপর অত্যাচার না কর। তারপর দরজীর কাছে গিয়ে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতে হবে। তারপর আর কি কি জিনিস নষ্ট কর দেখা যাবে।”

যতীনের তখন চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে কাঁদতে কোনো রকমে অন্য চটিটা সেলাই করল। ভাগ্যিস এ পাটি বেশি ছেঁড়া ছিল না। তখন মুচিরা তাকে একটা পাঁচতলা উঁচু বাড়ির কাছে নিয়ে গেল। সে বাড়িতে সিঁড়ি বরাবর একতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গেছে। তারা যতীনকে সিঁড়ির নিচে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, “যাও, একেবারে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে যাও, আবার নেমে এস। দেখো, আস্তে আস্তে একটি একটি সিঁড়ি উঠবে নামবে।” যতীন পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গিয়ে নেমে এল। সে নিচে আসলে মুচিরা বলল, “হয়নি। তুমি তিনবার দুটো সিঁড়ি এক সঙ্গে উঠেছ, পাঁচবার লাফিয়েছ, তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙ্গিয়েছ। আবার ওঠ। মনে থাকে যেন, একটুও লাফাবে না, একটাও সিঁড়ি ডিঙ্গোবে না।” এতটা সিঁড়ি উঠে নেমে যতীন বেচারীর পা টনটন করছিল, সে এবার আস্তে আস্তে উপরে উঠল, আস্তে আস্তে নেমে এল। তারা বলল, “আচ্ছা এবার মন্দ হয়নি। তাহলে চল দরজীর কাছে।”

এই বলে তারা তাকে আর একটা মাঠে নিয়ে গেল, সেখানে খালি দরজীরা বসে বসে সেলাই করছে। যতীনকে দেখেই তারা জিগগেস করল, “কি? কি ছিঁড়েছ?” মুচিরা উত্তর দিল, “নতুন ধুতিটা, দেখ কতটা ছিঁড়ে ফেলেছে।” দরজীরা মাথা নেড়ে বলল, “বড় অন্যায়, বড় অন্যায়। শিগগির সেলাই কর।” যতীনের আর ‘না’ বলবার সাহস হল না। সে ছুঁচ-সুতো নিয়ে ছেঁড়া কাপড় জুড়তে বসে গেল। সবে মাত্র দুফোঁড় দিয়েছে, অমনি দরজীরা চেঁচিয়ে উঠল, “ওকে কি সেলাই বলে ? খোল খোল।” অমনি করে, বেচারি যতবার সেলাই করে, ততবার তারা বলে, “খোলা খোলা।” শেষে সে একেবারে কেঁদে ফেলে বলল, “আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। আমাকে বাড়ি পৌছে দাও, আমি আর কখনও কাপড় ছিঁড়ব না, ছাতা ছিড়ব না।” তাতে

দরজীরা হাসতে হাসতে বলল, “খিদে পেয়েছে? তা তোমার খাবার জিনিস তো আমাদের কাছে ঢের আছে।” এই বলে তারা তাদের কাপড়ে দাগ দেবার পেন্সিল কতকগুলো এনে দিল। “তুমি তো পেন্সিল চিবোতে ভালোবাস, এইগুলো চিবিয়ে খাও, আর কিছু আমাদের কাছে নেই।”

এই বলে তারা যার যার কাজে চলে গেল। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যতীন কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে শুয়ে পড়ল। এমন সময় আকাশে বোঁ বোঁ করে কিসের শব্দ হল, আর যতীনের তালি-দেওয়া সাধের ঘুড়িটা গোঁৎ খেয়ে এসে তার কোলের উপর পড়ল। ঘুড়িটা ফিসফিস্ করে বলল, “তুমি আমাকে যত্ন করেছ, তাই আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি। শিগগির আমার লেজটা ধর।” যতীন তাড়াতাড়ি ঘুড়ির লেজ ধরল। ঘুড়িটা অমনি তাকে নিয়ে সোঁ করে আকাশে উঠে গেল। সেই শব্দ শুনে দরজীরা বড় বড় কাঁচি নিয়ে ছুটে এল ঘুড়ির সুতোটা কেটে দিতে। হঠাৎ ঘুড়ি আর যতীন জড়াজড়ি করে নিচের দিকে পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে যেই মাটিটা ধাঁই করে যতীনের মাথায় লাগল, অমনি সে চমকে উঠল। ঘুড়িটার কি হল কে জানে! যতীন দেখল সে সিঁড়ির নিচে শুয়ে আছে, আর তার মাথায় ভয়ানক বেদনা হয়েছে।

কিছুদিন ভুগে যতীন সেরে উঠল। তার মা বলতেন, “আহা, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে, এই ভোগানিতে বাছা আমার বড় দুর্বল হয়ে গেছে। সে স্ফুর্তি নেই, সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চলা নেই, তা নইলে এক জোড়া জুতো চার মাস যায়?”

আসল কথা—যতীন এখনও সেই মুচিদের আর দরজীদের কথা ভুলতে পারেনি।

জলধরের মামা পুলিশের চাকরি করেন, আর তার পিসেমসাই লেখেন ডিটেক্টিভ উপন্যাস। সেইজন্য জলধরের বিশ্বাস যে, চোর-ডাকাত জাল-জুয়াচোর জব্দ করবার সব রকম সঙ্কেত সে যেমন জানে, এমনটি তার মামা আর পিসেমশাই ছাড়া কেউ জানে না। কারও বাড়িতে চুরি-টুরি হলে জলধর সকলের আগে সেখানে হাজির হয়। আর, কে চুরি করল, কি করে চুরি হল, সে থাকলে এমন অবস্থায় কি করত, এ-সব বিষয়ে খুব বিজ্ঞের মতো কথা বলতে থাকে। যোগেশবাবুর বাড়িতে যখন বাসন চুরি হল, তখন জলধর তাদের বললে "আপনারা একটুও সাবধান হতে জানেন না, চুরি তো হবেই। দেখুন তো ভাঁড়ার ঘরের পাশেই অন্ধকার গলি। তার উপর জানলার গরাদ নেই। একটু সেয়ানা লোক হলে এখান দিয়ে বাসন নিয়ে পালাতে কতক্ষণ ? আমাদের বাড়িতে ও-সব হবার জো নেই। আমি রামদিনকে ব'লে রেখেছি, জানলার গায়ে এমন ভাবে বাসনগুলো ঠেকিয়ে রাখবে যে জানালা খুলতে গেলেই বাসনপত্র সব ঝনঝন করে মাটিতে পড়বে। চোর জব্দ করতে হলে এ-সব কায়দা জানতে হয়।" সে সময়ে আমরা সকলেই জলধরের বুদ্ধির খুব প্রশংসা করেছিলাম, কিন্তু পরের দিন যখন শুনলাম সেই রাত্রে জলধরের বাড়িতে মস্ত চুরি হয়ে গেছে, তখন মনে হল, আগের দিন অতটা প্রশংসা করা উচিত হয়নি। জলধর কিন্তু তাতেও কিছুমাত্র দমেনি। বলল, "ঐ আহাম্মক রামদিনটার বোকামিতে সব মাটি হয়ে গেল। যাক, আমার জিনিস চুরি করে তাকে আর হজম করতে হবে না। দিন দুচার যেতে দাও না।"

দু মাস গেল, চার মাস গেল, চোর কিন্তু আর ধরাই পড়ল না। চোরের উপদ্রবের কথা আমরা সবাই ভুলে গেছি, এমন সময় হঠাৎ আমাদের ইস্কুলে আবার চুরির হাঙ্গামা শুরু হল। ছেলেরা অনেকে টিফিন নিয়ে আসে, তা থেকে খাবার চুরি যেতে লাগল। প্রথম দিন রামপদর খাবার চুরি যায়। সে বেঞ্চির উপর খানিকটা রাবড়ি আর লুচি রেখে হাত ধুয়ে আসতে গেছে—এর মধ্যে কে এসে লুটিটুচি বেমালুম খেয়ে গিয়েছে। তারপর ক্রমে আরো দু-চারটি ছেলের খাবার চুরি হল। তখন আমরা জলধরকে বললাম, "কি হে ডিটেকটিভ! এই বেলা যে তোমার চোর-ধরা বুদ্ধি খোলে না, তার মানেটা কি

বল দেখি?" জলধর বলল, "আমি কি আর বুদ্ধি খাটাচ্ছি না ? সবুর কর না।" তখন সে খুব সাবধানে কানে কানে এ কথা জানিয়ে দিল যে, ইস্কুলের যে নতুন ছোকরা বেয়ারা এসেছে, তাকেই সে চোর বলে সন্দেহ করে। কারণ, সে আসবার পর থেকে চুরি আরম্ভ হয়েছে। আমরা সবাই সেদিন থেকে তার উপর চোখ রাখতে শুরু করলাম। কিন্তু দুদিন না যেতেই আবার চুরি! পাগলা দাশু বেচারা বাড়ি থেকে মাংসের চপ এনে টিফিন ঘরের বেঞ্চের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল, কে এসে তার আধখানা খেয়ে বাটিটুকু ধুলোয় ফেলে নষ্ট করে দিয়েছে। পাগলা তখন রাগের চোটে চীৎকার করে গাল দিয়ে ইস্কুল বাড়ি মাথায় করে তুলল। আমরা সবাই বললাম, "আরে চুপ্ চুপ্ অত চেঁচাসনে। তা হলে চোর ধরা পড়বে কি করে?" কিন্তু পাগলা কি সে-কথা শোনে? তখন জলধর তাকে বুঝিয়ে বলল, "আর দুদিন সবুর কর, ঐ নতুন ছোকরাটাকে আমি হাতে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছি—এ সমস্ত ওরই কারসাজি।" শুনে দাশু বলল, "তোমার যেমন বুদ্ধি! ওরা হল পশ্চিমা ব্রাহ্মণ, ওরা আবার মাংস খায় নাকি? দারোয়ানজীকে জিগগেস কর তো?" সত্যিই আমাদের তো সে-খেয়াল হয়নি! ছোকরা তো কতদিন রুটি পাকিয়ে খায়, কই একদিনও তো ওকে মাছ-মাংস খেতে দেখি না। দাশু পাগলা হোক, আর যাই হোক, তার কথাটা সবাইকে মানতে হল।

জলধর কিন্তু অপ্রস্তুত হবার ছেলেই নয়। সে এক গাল হেসে বলল, "আমি ইচ্ছে করে তোদের ভুল বুঝিয়েছিলাম। আরে, চোরকে না ধরা পর্যন্ত কি কিছু বলতে আছে ? কোনো পাকা ডিটেকটিভ ও-রকম করে না। আমি মনে মনে যাকে চোর বলে ধরেছি, সে আমিই জানি।"

তারপর কদিন আমরা খুব হুঁশিয়ার ছিলাম, আট-দশদিন আর চুরি হয়নি। তখন জলধর বললে, "তোমরা গোলমাল করেই তো সব মাটি করলে। চোরটা টের পেয়ে গেল যে আমি তার পেছনে লেগেছি। আর কি সে চুরি করতে সাহস পায়? তবু ভাগ্যিস তোমাদের কাছে আসল নামটা ফাঁস করিনি।" কিন্তু সেই দিনই আবার শোনা গেল, স্বয়ং হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে থেকে তার টিফিন খাবার চুরি হয়ে গেছে। আমরা বললাম, "কই হে ?

চোর না তোমার ভয়ে চুরি করতে পারছিল না ? তার ভয় যে ঘুচে গেল দেখছি।”

তারপর দুদিন ধরে জলধরের মুখে আর হাসি দেখা গেল না। চোরের ভাবনা ভেবে ভেবে তার পড়াশুনা এম্নি গুলিয়ে গেল যে পণ্ডিত মহাশয়ের ক্লাশে সে আরেকটু হলেই মার খেত আর কি! দুদিন পর সে আমাদের সকলকে ডেকে একত্র করল, আর বলল, তার চোর ধরবার বন্দোবস্ত ঠিক হয়েছে। টিফিনের সময় সে একটা ঠোঙায় করে সরভাজা, লুচি আর আলুর দম রেখে চলে আসবে। তারপর কেউ যেন সেদিকে না যায়। ইস্কুলের বাইরে থেকে লুকিয়ে টিফিনের ঘরটা দেখা যায়। আমরা কয়েকজন বাড়ি যাবার ভান করে সেখানে থাকব। আর কয়েকজন থাকবে উঠোনের পশ্চিম কোণের ছোট ঘরটাতে। সুতরাং চোর যেদিক থেকেই আসুক, টিফিন ঘরে ঢুকতে গেলেই তাকে দেখা যাবে।

সেদিন টিফিনের ছুটি পর্যন্ত কারও আর পড়ায় মন বসে না। সবাই ভাবছে কতক্ষণে ছুটি হবে, আর চোর কতক্ষণে ধরা পড়বে। চোর ধরা পড়লে তাকে নিয়ে কি করা যাবে, সে বিষয়েও কথাবার্তা হতে লাগল। মাস্টারমশাই বিরক্ত হয়ে ধমকাতে লাগলেন, পরেশ আর বিশ্বনাথকে বেঞ্চির উপর দাঁড়াতে হল—কিন্তু সময়টা যেন কাটতেই চায় না। টিফিনের ছুটি হতেই জলধর তার খাবারের ঠোঙাটা টিফিন-ঘরে রেখে এলো। জলধর, আমি আর দশ-বারোজন উঠোনের কোণের ঘরে রইলাম, আর একদল ছেলে বাইরে জিমনাস্টিকের ঘরে লুকিয়ে থাকল। জলধর বলল, “দেখ চোরটা যে রকম সেয়ানা দেখছি, আর তার যে রকম সাহস, তাকে মারধর করা ঠিক হবে না। লোকটা নিশ্চয় খুব ষণ্ডা হবে। আমি বলি, সে যদি এদিকে আসে, তাহলে সবাই মিলে তার গায়ে কালি ছিটিয়ে দেব আর চেঁচিয়ে উঠব। তাহলে দারোয়ান-টারোয়ান সব ছুটে আসবে। আর, লোকটা পালাতে গেলেও ঐ কালির চিহ্ন দেখে ঠিক ধরা যাবে।”

আমাদের রামপদ বলে উঠল, “কেন? সে যে খুব ষণ্ডা হবে তার মানে কি? সে কিছু রাক্ষসের মতো খায় বলে তো মনে হয় না। যা চুরি করে নিচ্ছে সে তো কোনো দিনই খুব বেশি নয়।” জলধর বলল, “তুমিও যেমন পণ্ডিত। রাক্ষসের মতো খানিকটা খেলেই বুঝি ষণ্ডা হয়? তাহলে তো আমাদের শ্যামাদাসকেই সকলের চেয়ে ষণ্ডা বলতে হয়। সেদিন ঘোষেদের নেমন্তন্নে ওর খাওয়া দেখেছিলে তো! বাপু হে, আমি যা বলছি তার উপর ফোড়ন দিতে যেও না। আর তোমার যদি নেহাৎ সাহস থাকে, তুমি গিয়ে চোরের সঙ্গে লড়াই কর। আমরা কেউ তাতে আপত্তি করব না। আমি জানি, এ-সমস্ত নেহাৎ যেমন-তেমন চোরের সাধ্য নয়। আমার খুব বিশ্বাস, যে লোকটা আমাদের বাড়িতে চুরি করেছিল—এ-সব তারই কাণ্ড।”

এমন সময় হঠাৎ টিফিন-ঘরের বাঁ দিকের জানলাটা খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল, যেন কেউ ভিতর থেকে ঠেলছে। তার পরেই শাদা মতন কি একটা ঝুপ করে উঠোনের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। আমরা চেয়ে দেখলাম, একটা মোটা হুলো বেড়াল—তাঁর মুখে জলধরের সরভাজা! তখন যদি জলধরের মুখখানা দেখতে, সে এক বিঘৎ উঁচু হাঁ করে উঠোনের দিকে তাকিয়ে রইল। আমরা জিগগেস করলাম, “কেমন হে ডিটেকটিভ! ঐ ষণ্ডা চোরটাই তো তোমার বাড়িতে চুরি করেছিল? তাহলে এখন ওকেই পুলিশে দিই?”

'টোকিয়ো-কিয়োটো—নাগাসাকি—য়োকোহামা'—বোর্ডের উপর প্রকাণ্ড ম্যাপ ঝুলিয়ে হারাণচন্দ্র জাপানের প্রধান নগরগুলি দেখিয়ে যাচ্ছে, এর পরেই ব্যোমকেশের পালা, কিন্তু ব্যোমকেশের সে খেয়ালই নেই। কাল বিকেলে ডাক্তারবাবুর ছোট্ট ছেলেটার সঙ্গে প্যাঁচ খেলতে গিয়ে তার দু-দুটো ঘুড়ি কাটা গিয়েছিল, সে-কথাটা ব্যোমকেশ কিছুতেই আর ভুলতে পারছে না। তাই সে বসে বসে সুতোর জন্যে কড়া রকমের একটা মাঞ্জা তৈরির উপায় চিন্তা করছে। চীনে শিরিষ গালিয়ে, তার মধ্যে বোতলচুর আর কড়কড়ে এমেরি পাউডার মিশিয়ে সুতোয় মাখলে পর কি রকম চমৎকার মাঞ্জা হবে, সেই কথা ভাবতে ভাবতে উৎসাহে তার দুই চোখ কড়িকাঠের দিকে গোল হয়ে উঠছে। মনে মনে মাঞ্জা দেওয়া ঘুড়ি সুতোটা সবে তালগাছের আগা পর্যন্ত উঠে, আশ্চর্য কায়দায় ডাক্তারের ছেলের ঘুড়িটাকে কাটতে যাচ্ছে, এমন সময়ে গম্ভীর গলায় ডাক পড়ল—''তারপর, ব্যোমকেশ এস দেখি।''

ঐ রকম ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে, সুতো-মাঞ্জা, ঘুড়ির প্যাঁচ সব ফেলে আকাশের উপর থেকে ব্যোমকেমকে হঠাৎ নেমে আসতে হল একেবারে চীন দেশের মধ্যিখানে। একে তো ও দেশটার সঙ্গে তার পরিচয় খুব বেশি ছিল না, তার উপর যা-ও দু-একটা চীনদেশী নাম সে জানত, ওরকম হঠাৎ নেমে আসবার দরুন, সেগুলোও তার মাথার মধ্যে কেমন বিচ্ছিরি রকম ঘণ্ট পাকিয়ে গেল। পাহাড়, নদী, দেশ, উপদেশের মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতে না বেচারা বেমালুম পথ হারিয়ে ফেলল। তার কেবলই মনে হতে লাগল যে চীনদেশের চিনে শিরীষ, তাই দিয়ে হয় মাঞ্জা। মাস্টারমশাই দু-বার তাড়া দিয়ে যখন তৃতীয়বার চড়া গলায় বললেন, "চীন দেশের নদী দেখাও" তখন বেচারা একেবারেই দিশেহারা আর মরিয়া মতন হয়ে বললে—''সাংহাই।'' সাংহাই বলবার আর কোনো কারণ ছিল না, বোধ হয় তার সেজ মামার যে স্ট্যাম্প সংগ্রহের খাতা আছে, তার মধ্যে ঐ নামটাকে সে পেয়ে থাকবে—বিপদের ধাক্কায় হঠাৎ কেমন করে ঐটেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

গোটা দুই চড়-চাপড়ের পর ব্যোমকেশবাবু তাঁর কানের উপর মাস্টারমশায়ের প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে, বিনা আপত্তিতে বেঞ্চের উপর আরোহণ করলেন। কিন্তু কানদুটো জুড়োতে না জুড়োতেই মনটা তার খেই-হারানো ঘুড়ির পিছনে উধাও হয়ে, আবার সুতোর মাঞ্জা তৈরি করতে বসল। সারাটা দিন বকুনি খেয়েই তার সময় কাটল, কিন্তু এর মধ্যে কত উঁচুদরের মাঞ্জা-দেওয়া সুতো তৈরি হল আর কত যে ঘুড়ি গণ্ডায় গণ্ডায় কাটা পড়ল, সে জানে কেবল ব্যোমকেশ।

বিকেলবেলায় সবাই যখন বাড়ি ফিরছে, তখন ব্যোমকেশ দেখল, ডাক্তারের ছেলেটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মস্ত একটা লাল রঙের ঘুড়ি কিনছে। দেখে ব্যোমকেশ বন্ধু পাঁচকড়িকে বলল, ‘‘দেখেছিস পাঁচু, আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে আবার ঘুড়ি কেনা হচ্ছে!’’ এই ব’লে সে পাঁচুর কাছে তার মাঞ্জা তৈরির মতলবটা খুলে বলল। শুনে পাঁচু গম্ভীর হয়ে বলল, ‘‘তা যদি বলিস, তুই আর মাঞ্জা তৈরি করে ওদের সঙ্গে পারবি ভেবেছিস ? ওরা হল ডাক্তারের ছেলে, নানা রকম ওষুধ মশলা জানে। এই তো সেদিন ওর দাদাকে দেখলুম, শানের উপর কি একটা আরক ঢেলে দিলে, আর ভসভস করে গ্যাঁজালের মতো তেজ বেরুতে লাগল। ওরা যদি মাঞ্জা বানায়, তা হলে কারু মাঞ্জার সাধ্যি নেই যে তার সঙ্গে পেরে ওঠে।’’ শুনে ব্যোমকেশের মনটা কেমন দমে গেল। তার ধ্রুব রকম বিশ্বাস হল যে, ডাক্তারের ছেলেটা নিশ্চয় কোনো আশ্চর্য রকম মাঞ্জার খবর জানে। তা নইলে ব্যোমকেশের চাইতেও চার বছরের ছোট হয়ে, সে কেমন করে তার ঘুড়ি কাটল? ব্যোমকেশ স্থির করল, যেমন করে হোক ওদের বাড়ির মাঞ্জা খানিকটা যোগাড় করতেই হবে।

সেটা একবার আদায় করতে পারলে, তারপর সে ডাক্তারের ছেলেকে দেখে নেবে।

বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি জলখাবার সেরে নিয়ে ব্যোমকেশ দৌড়ে গেল ডাক্তারবাবুর ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করতে। সেখানে গিয়ে সে দেখে কি, কোণের বারান্দায় বসে সেই ছোট্ট ছেলেটা একটা ডাক্তারি থলের মধ্যে কি যেন মশলা ঘুঁটছে। ব্যোমকেশকে দেখে সে একটা চৌকির তলায় সব লুকিয়ে

ফেলে সেখান থেকে সরে পড়ল। ব্যোমকেশ মনে মনে বললে, ‘বাপু হে! এখন আর লুকিয়ে করবে কি? তোমার আসল খবর আমি পেয়েছি’—এই ব’লে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে, কোথাও কেউ নেই। একবার সে ভাবল, কেউ আসলে এর একটুখানি চেয়ে নেব। আবার মনে হল, কি জানি চাইলে যদি না দেয়? তারপর ভাবলে, দূর! ভারি তো জিনিস, তা আবার চাইবার দরকার কি? এই এতটুকু মাঞ্জা হলেই প্রায় দুশো গজ সুতোয় শান দেওয়া হবে। এই ভেবে সে চৌকির তলা থেকে এক খাবল মশলা তুলে নিয়েই এক দৌড়ে বাড়ি এসে হাজির!

আর কি তখন দেরি সয়? দেখতে দেখতে দক্ষিণের বারান্দা জুড়ে সুতো খাটিয়ে, মহা উৎসাহে মাঞ্জা দেওয়া শুরু হল। যাই বল, মাঞ্জাটা কিন্তু ভারি অদ্ভুত—কই, তেমন কড়কড় করছে না তো! বোধ হয়, খুব মিহি গুঁড়োর তৈরি—আর কালো কাচের গুঁড়ো। দুঃখের বিষয়, বেচারার কাজটা শেষ না হতেই সন্ধ্যা হয়ে এল, আর তার বড়দা এসে বললে, “যা, যা! আর সুতো পাকাতে হবে না, এখন পড়্গে যা।”

সে রাত্তিরে ব্যোমকেশের ভালো করে ঘুমই হল না। সে স্বপ্ন দেখল যে, ডাক্তারের ছেলেটা হিংসে করে তার চমৎকার সুতোয় জল ফেলে সব নষ্ট করে দিয়েছে। সকাল হতে না হতেই ব্যোমকেশ দৌড়ে গেল তার সুতোর খবর নিতে। কিন্তু গিয়েই দেখে, কে এক বুড়ো ভদ্রলোক ঠিক বারান্দার দরজার সামনে বসে তার দাদার সঙ্গে গল্প করছেন, তামাক খাচ্ছেন। ব্যোমকেশ ভাবলে, দেখ তো কি অন্যায়! এর মধ্যে থেকে এখন সুতোটা আনি কেমন করে? যাহোক, খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সে খুব সাহসের সঙ্গে গিয়ে, চট করে তার সুতো খুলে নিয়ে চলে আসছে—এমন সময় হঠাৎ কাশতে গিয়ে বুড়ো লোকটির কলকে থেকে খানিকটা টিকে গেল মাটিতে পড়ে। বৃদ্ধ তখন ব্যস্ত হয়ে হাতের কাছে কিছু না পেয়ে, ব্যোমকেশের সেই মাঞ্জা মাখানো কাগজটা দিয়ে টিকেটাকে তুলতে গেলেন।

সর্বনাশ! যেমন টিকের উপর কাগজ ছোঁয়ানো, অমনি কিনা ভসভস্ করে কাগজ জ্বলে উঠে ভদ্রলোকের আঙুল-টাঙুল পুড়ে, বারান্দার বেড়ায় আগুন-

টাগুন লেগে এক হুলুস্থুল কাণ্ড! অনেক চেঁচামেচি ছুটোছুটি আর জল ঢালাঢালির পর যখন আগুনটুকু নিভে এল, আর ভদ্রলোকের আঙুলের ফোস্কায় মলম দেওয়া হল, তখন তার দাদা এসে তার কান ধরে বললেন, ‘‘হতভাগা! কি রেখেছিলি কাগজের মধ্যে বল তো?’’ ব্যোমকেশ কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, ‘‘কিচ্ছু তো রাখিনি, খালি সুতোর মাঞ্জা রেখেছিলাম।’’ দাদা তার কৈফিয়ৎটাকে নিতান্তই আজগুবি মনে করে, ‘‘আবার এয়ার্কি হচ্ছে?’’ ব’লে বেশ দু-চার ঘা কষিয়ে দিলেন। বেচারা ব্যোমকেশ এই বলে তার মনকে খুব খানিক সান্ত্বনা দিল যে, আর যাই হোক, তার সুতোটুকু রক্ষা পেয়েছে। ভাগ্যিস সে সময়মতো খুলে এনেছিল, নইলে তার সুতোও যেত, পরিশ্রমও নষ্ট হত।

বিকেলে সে বাড়ি এসেই চটপট ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে ছাতের উপর উঠল। মনে মনে বলল, ‘ডাক্তারের পো আজ একবার আসুক না, দেখিয়ে দেব প্যাঁচ খেলাটা কাকে বলে।’ এমন সময়ে পাঁচকড়ি এসে বড় বড় চোখ করে বললে, ‘‘শুনেছিস?’’ ব্যোমকেশ বললে, ‘‘না—কি হয়েছে?’’ পাঁচু বললে, ‘‘ওদের সেই ছেলেটাকে দেখে এলুম, সে নিজে নিজে দেশলাইয়ের মশলা বানিয়েছে, আর চমৎকার লাল নীল দেশলাই তৈরি করেছে।’’ ব্যোমকেশ হঠাৎ লাটাই-টাটাই রেখে, এত বড় হাঁ করে জিগগেস করলে, ‘‘দেশলাই কিরে! মাঞ্জা বল?’’ শুনে পাঁচু বেজায় চটে গেল, ‘‘বলছি লাল নীল আলো জ্বলছে, তবু বলবে মাঞ্জা, আচ্ছা গাধা যা হোক!’’

ব্যোমকেশ কোনো জবাব না দিয়ে, দেশলাইয়ের মশলা-মাখানো সুতোটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সেই সময় ডাক্তাদের বাড়ি থেকে লাল রঙের ঘুড়ি উড়ে এসে, ঠিক ব্যোমকেশের মাথার উপরে ফরফর করে তাকে যেন ঠাট্টা করতে লাগল। তখন সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, ‘‘আমার অসুখ করেছে।’’

তার আসল নামটি যজ্ঞদাস। সে প্রথম যেদিন আমাদের ক্লাশে এল পণ্ডিতমশাই তার নাম শুনেই ভ্রূকুটি করে বললেন, "যজ্ঞের আবার দাস কি? যজ্ঞেশ্বর বললে তবু না হয় বুঝি।" ছেলেটি বলল, "আজ্ঞে, আমি তো নাম রাখিনি, নাম রেখেছেন খুড়োমশাই।"

এই শুনে আমি একটু ফিক করে হেসে ফেলেছিলাম, তাই পণ্ডিতমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বানান কর যজ্ঞদাস।" আমি থতমত খেয়ে বললম, "র্বগীয় জ"- পণ্ডিতমশাই বললেন, "দাঁড়িয়ে থাক।" তারপর একটি ছেলে ঠিক বানান বললে পর তিনি আরেকজনকে বললেন, "সমাস কর।" সে তার সংস্কৃত বিদ্যা জাহির করে বললো, "যোগ্য শ্চেতি দাসশ্চসৌ।" পণ্ডিতমশাই তার কান ধরে বললেন, "বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাক।"

দুদিন না যেতেই বোঝা গেল যে, জগ্যিদাসের আর কোনো বিদ্যে থাকুক আর নাই থাকুক আজগুবি গল্প বলবার ক্ষমতাটি তার অসাধারণ। একদিন সে ইস্কুলে দেরি করে এসেছিল, কারণ জিগ্‌গেস করাতে সে বলল, "রাস্তায় আসতে পঁচিশটা কুকুর হাঁ হাঁ করে আমায় তেড়ে এসেছিল। ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে সেই কুণ্ডুদের বাড়ি পর্যন্ত চলে গিয়েছিলম।" পঁচিশটা দূরের কথা, দশটা কুকুরও আমরা এক সঙ্গে চোখে দেখিনি, কাজেই কথাটা মাষ্টারমশাইও বিশ্বাস করেননি। তিনি জিগ্‌গেস করলেন, "এত মিছে কথা বলতে শিখলে কার কাছে?" জগ্যিদাস বলল, "আজ্ঞে মামার কাছে।" সেদিন হেডমাস্টারের ঘরে জগ্যিদাসের ডাক পড়েছিল, সেখানে কি হয়েছিল আমরা জানি না, কিন্তু জগ্যিদাস যে খুশি হয়নি সেটা বেশ বোঝা গেল।

কিন্তু সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক, তার গল্প বলার বাহাদুরি ছিল। সে যখন বড় বড় চোখ করে গম্ভীর গলায় তার মামাবাড়ির ডাকাত ধরার গল্প বলত, তখন বিশ্বাস করি আর না করি শুনতে শুনতে আমাদের মুখ আপনা হতেই হাঁ হয়ে আসত। জগ্যিদাসের মামার কথা আমাদের ভারি আশ্চর্য ঠেকত। তার গায়ে নাকি যেমন জোর তেমনি অসাধারণ বুদ্ধি। তিনি যখন 'রামভজন' বলে চাকরকে ডাক দিতেন, তখন ঘর বাড়ি সব থরথর করে

কেঁপে উঠত। কুস্তি বল, লাঠি বল, ক্রিকেট বল, সবটাতেই তাঁর সমান দখল। প্রথমটা আমরা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু একদিন সে তার মামার ফটো এনে দেখাল। দেখলাম পালোয়ানের মতো চেহারা বটে ! এক-একবার ছুটি হত আর জগ্যিদাস তার মামার বাড়ি যেত, আর এসে সে সব গল্প বলত তা কাগজে ছাপবার মতো। একদিন স্টেশনে আমার সঙ্গে জগ্যিদাসের দেখা, একটা গাড়ির মধ্যে মাথায় পাগড়ি বাঁধা চমৎকার জাঁদরেল চেহারার একটি কোন দেশী ভদ্রলোক বসে। আমি ইস্কুলে ফিরতে ফিরতে জগ্যিদাসকে জিগ্‌গেস করলাম, "ঐ পাগড়ি বাঁধা লোকটাকে দেখেছিলি?" জগ্যিদাস বলল, "ঐ তো আমার মামা।" আমি বললাম, "ফটোতে তো কালো দেখেছিলম।" জগ্যিদাস বলল, "এবার সিম্‌লে গিয়ে ফরসা হয়ে এসেছেন।" আমি ইস্কুলে গিয়ে গল্প করলাম, "আজ জগ্যিদাসের মামাকে দেখে এলুম।" জগ্যিদাসও খুব বুক ফুলিয়ে মুখখানা গম্ভীর করে বলল, "তোমরা তো ভাই আমার কথা বিশ্বাস কর না। আচ্ছা, না হয় মাঝে মাঝে দুটো একটা গল্প ব'লে থাকি। তা ব'লে কি সবই আমার গল্প। আমার জলজ্যান্ত মামাকে সুদ্ধ তোমরা উড়িয়ে দিতে চাও ?" এ-কথায় অনেকেই মনে মনে লজ্জা পেয়ে, ব্যস্ত হয়ে বারবার বলতে লাগল, "আমরা কিন্তু গোড়া থেকেই বিশ্বাস করেছিলম।"

তারপর থেকে মামার প্রতিপত্তি ভয়ানক বেড়ে গেল। রোজই সব ব্যস্ত হয়ে থাকতাম মামার খবর শুনবার জন্য। কোনোদিন শুনতাম মামা গেছেন হাতি গণ্ডার বাঘ মারতে। কোনোদিন শুনতাম, একাই তিনি পাঁচটা কাবুলীকে ঠেঙিয়ে ঠিক করেছেন, এরকম প্রায়ই হত। তার পর একদিন সবাই আমরা টিফিনের সময় গল্প করছি, এমন সময় হেডমাস্টার মশাই ক্লাশে এসে বললেন, "যজ্ঞদাস, তোমার মামা এসেছেন।" হঠাৎ যজ্ঞদাসের মুখখানা আমসির মতো শুকিয়ে গেল- সে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে কি যেন বলতে গিয়ে আর বলতে পারল না। তারপর লক্ষ্মী ছেলেটির মতো চুপচাপ মাস্টার মশায়ের সঙ্গে চলল। আমরা বললাম, ভয় হবে না? জানো তো কি রকম মামা !" সবাই মিলে উৎসাহ আর আগ্রহে মামা দেখবার জন্য একেবারে ঝুঁকে পড়লাম। গিয়ে দেখি, একটি রোগা কালো ছোকরা গোছের ভদ্রলোক, চশমা চোখে গোবেচারার মতো বসে আছেন। জগ্যিদাস তাঁকেই গিয়ে প্রণাম করল।

সেদিন সত্যিসত্যিই আমাদের রাগ হয়েছিল। এম্নি করে ফাঁকি দেওয়া। মিথ্যে করে মামা তৈরি ! সেদিন আমাদের ধমকের চোটে জগ্যিদাস কেঁদেই ফেলল। সে তখন স্বীকার করল যে, ফটোটা কোনো এক পশ্চিমা পালোয়ানের। আর সেই ট্রেনের লোকটাকে সে চেনেই না। তারপরে কোনো আজগুবি জিনিসের কথা বলতে হলেই আমরা বলতাম, "জগ্যিদাসের মামার মতো। "

“পণ্ডিতমশাই, ভোলা আমায় ভ্যাংচাচ্ছে।” “না পণ্ডিতমশাই, আমি কান চুলকোচ্ছিলাম, তাই মুখ বাঁকা মতো দেখাচ্ছিল!” পণ্ডিতমশাই চোখ না খুলিয়াই অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন, “আঃ! কেবল বাঁদরামি! দাঁড়িয়ে থাক।” আধমিনিট পর্যন্ত সব চুপচাপ। তারপর আবার শোনা গেল, “দাঁড়াচ্ছিস না যে?” “আমি দাঁড়াব কেন?” “তোকেই তো দাঁড়াতে বললে।” “যাঃ আমায় বলেছে না আর কিছু! গণশাকে জিগগেস কর? কিরে গণশা, ওকে দাঁড়াতে বলেছে না?” গণেশের বুদ্ধি কিছু মোটা, সে আস্তে আস্তে উঠিয়া গিয়া পণ্ডিতমশাইকে ডাকিতে লাগিল, “পণ্ডিতমশাই!” পণ্ডিতমশাই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “কি বল না।” গণেশচন্দ্র অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “কাকে দাঁড়াতে বলেছেন, পণ্ডিতমশাই?” পণ্ডিতমশাই কটমটে চোখ মেলিয়াই সাংঘাতিক ধমক দিয়া বলিলেন, “তোকে বলছি, দাঁড়া।” বলিয়াই আবার চোখ বুজিলেন।

গণেশচন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিল। আবার মিনিট খানেক সব চুপচাপ। হঠাৎ ভোলা বলিল, “ওকে এক পায়ে দাঁড়াতে বলেছিল না ভাই?” গণেশ বলিল, “কক্ষনো না, কালি দাঁড়া বলেছে।” বিশু বলিল, “এক আঙুল তুলে দেখিয়েছিল, তার মানেই এক পায়ে দাঁড়া।” পণ্ডিতমশাই যে ধমক দিবার সময় তর্জনী তুলিয়াছিলেন, এ কথা গণেশ অস্বীকার করিতে পারিল না। বিশু আর ভোলা জেদ করিতে লাগিল, “শিগগির এক পায়ে দাঁড়া বলছি, তা না হলে এক্ষুনি বলে দিচ্ছি।”

গণেশ বেচারা ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি এক পা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অমনি ভোলা আর বিশুর মধ্যে তুমুল তর্ক বাধিয়া গেল। এ বলে ডান পায়ে দাঁড়ানো উচিত; ও বলে, না, আগে বাঁ পা। গণেশ বেচারার মহা মুশকিল! সে আবার পণ্ডিতমশাইকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল, “পণ্ডিতমশাই, কোন পা?”

পণ্ডিতমশাই তখন কি যেন একটা স্বপ্ন দেখিয়া অবাক হইয়া নাক ডাকাইতেছিলেন। গণেশের ডাকে হঠাৎ তন্দ্রা ছুটিয়া যাওয়ায় তিনি সাংঘাতিক

রকম বিষম খাইয়া ফেলিলেন। গণেশ বেচারা তার প্রশ্নের এ রকম জবাব একেবারেই কল্পনা করে নাই, সে ভয় পাইয়া বলিল, "ঐ যা কি হবে?" দৌড়ে কোথা হইতে একটা কুঁজো আনিয়া ঢকঢক্ করিয়া পণ্ডিতমশাইয়ের টাকের উপর জল ঢালিতে লাগিল। পণ্ডিত মশায়ের বিষম খাওয়া খুব চটপট থামিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া গণেশের হাতের জলের কুঁজা ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ভয়ে সকলেই খুব গম্ভীর হইয়া রহিল, খালি শ্যামলাল বেচারার মুখটাই কেমন যেন আহ্লাদি গোছের হাসি হাসি মতো, সে কিছুতেই গম্ভীর হইতে পারিল না। পণ্ডিতমশায়ের রাগ হঠাৎ তার উপরেই ঠিকরাইয়া পড়িল। তিনি বাঘের মতো গুমগুমে গলায় বলিলেন, "উঠে আয়!" শ্যামলাল ভয়ে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "আমি কি করলাম? গণশা জল ঢাললে, তা আমার দোষ কি?" পণ্ডিতমশাই মানুষ ভালো, তিনি শ্যামলালকে ছাড়িয়া গণশার দিকে তাকাইয়া দেখেন, তাহার হাতে তখনও জলের কুঁজা। গণেশ কোনো প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই বলিয়া ফেলিল, "ভোলা আমাকে বলেছিল।" ভোলা বলিল, "আমি তো খালি জল আনতে বলেছিলাম। বিশু বলেছিল, মাথায় ঢেলে দে।" বিশু বলিল, "আমি কি পণ্ডিতমশায়ের মাথায় দিতে বলেছিলাম? ওর নিজের মাথায় দেওয়া উচিত ছিল, তাহলে বুদ্ধিটা ঠাণ্ডা হত।"

পণ্ডিতমশাই কানিকক্ষণ কটমট করিয়া সকলের দিকে তাকাইয়া তারপর বলিলেন, "যা! তোরা ছেলেমানুষ তাই কিছু বললাম না। খবরদার আর অমন করিসনে।" সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু পণ্ডিতমশাই কেন যে হঠাৎ নরম হইয়া গেলেন, কেহ তাহা বুঝিল না। পণ্ডিতমশায়ের মনে হঠাৎ যে তাঁর নিজের ছেলেবেলার কোন দুষ্টুমির কথা মনে পড়িয়া গেল, তাহা কেবল তিনিই জানেন।

কালাচাঁদ নিধিরামকে মারিয়াছে—তাই নিধিরাম হেডমাস্টার মশায়ের কাছে নালিশ করিয়াছে। হেডমাস্টার আসিয়া বলিলেন, "কি হে কালাচাঁদ, তুমি নিধিরামকে মেরেছ? কালাচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে না, মারব কেন? কান মলে দিয়েছিলাম, গালে খামচিয়ে দিয়েছিলাম, আর একটুখানি চুল ধরে ঝাঁকিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলাম।" হেড মাস্টার মশায় বলিলেন, "কেন ওরকম করেছিলে?" কাঁলাচাঁদ খানিকটা আমতা আমতা করিয়া মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, ও খালি আমায় চটাচ্ছিল।" হেডমাস্টার মশাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় মেরেছিল?" "না।" "ধমকিয়েছিল?" "না।" "তবে?" "বার বার ঘ্যান ঘ্যান করে বোকার মতো কথা বলছিল, তাই, আমার রাগ হয়ে গেল।" হেডমাস্টার মশাই তাহার কান ধরিয়া বেশ ভালোরকম নাড়াচাড়া দিয়া বলিলেন, "মেজাজটা এখন থেকে একটু সংশোধন করতে চেষ্টা কর।"

ছুটির পর আমরা জিজ্ঞাসা বলিলাম, "হ্যাঁরে কালাচাঁদ, তুই খামকা ঐ নিধেটাকে মারতে গেলি কেন?" কালাচাঁদ বলিল, "খামকা মারব কেন? কেন মেরেছিলাম ওকেই জিজ্ঞাসা কর না!" নিধেকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, "খামকা নয় তো কি? তুই বাপু ছবি এঁকেছিস, তার কথা আমায় জিগগেস করতে গেলি কেন? আর যদি জিগগেস করলি, তাহলে তাই নিয়ে আবার মারামারি করতে এলি কেন?" আমরা বললাম, "আরে কি হয়েছে খুলেই বল্ না কেন।"

নিধিরাম বলিল, "কালাচাঁদ একটা ছবি এঁকেছে, ছবির নাম—খাণ্ডব দাহন। সেই ছবিটা আমায় দেখিয়ে ও জিগগেস করল, 'কেমন হয়েছে?' আমি বললাম, 'এটা কি এঁকেছ? মন্দিরের সামনে শিয়াল ছুটছে?' কালাচাঁদ বলল, 'না, না, মন্দির কোথায়? ওটা হল রথ। আর এগুলো তো শেয়াল নয়—রথের ঘোড়া।' আমি বললাম, 'সূর্যটাকে কালো করে এঁকেছ কেন? আর ঐ চামচিকেটা লাঠি নিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে কেন?' কালাচাঁদ বলল, 'আহা তা কেন? ওটা তো সূর্য নয়, সুদর্শন চক্র। দেখছ না কৃষ্ণের হাতে

রয়েছে? আর তালগাছ কোথায় দেখলে? ওটা তো অর্জুনের পাতাকা! আর ঐগুলোকে বুঝি পদ্মফুল বলছ? ওগুলো দেবতা— খুব দূরে আছেন কিনা, তাই ছোট ছোট দেখাচ্ছে। আর এই বুঝি চামচিকে হল, এটা তো গরুড়পাখি! একটা সাপকে তাড়া করছে।' আমি বললাম, 'তা হবে। আমি ওসব বুঝি টুঝি না। আচ্ছা ঐ কালো কাপড় পরা মেয়েমানুষটি যে ওদের মারতে আসছে, ওটি কে?' কাঁলাচাঁদ বলল, 'তুমি তো মহা মুখ্যু হে! ওটা গাছে আগুন লেগে ধোঁয়া বেরুচ্ছে বুঝতে পারছ না? অবাক করলে যে!'

"তখন আমি বললাম, 'আচ্ছা এক কাজ কর না কেন ভাই, ওটাকে খাণ্ডব দাহন না করে সীতার অগ্নিপরীক্ষা কর না কেন? ঐ গাছটাকে শাড়ি পরিয়ে সীতা করে দাও। ঐ রথটার মাথায় জটা-টটা দিয়ে ওকে অগ্নিদেব বানাও, কৃষ্ণ অর্জুন আছেন তাঁরা হবেন রাম লক্ষ্মণ। আর ঐ সুদর্শন চক্রে নাক হাত পা জুড়ে দিলেই ঠিক বিভীষণ হয়ে যাবে। তারপর চামচিকের পিছনে একটা লম্বা ল্যাজ দিয়ে তার ডানা দুটো মুছে দাও—ওটা হনুমান হবে এখন।' কাঁলাচাঁদ বলল, 'হনুমানও হতে পারে, নিধিরামও হতে পারে।'

"আমি বললাম, 'তাহলে ভাই, আর এক কাজ কর। ওটাকে শিশুপাল-বধ করে দাও। তাহলে কৃষ্ণকে বদলাতে হবে না। চক্র তুলে শিশুপালকে মারতে যাচ্ছেন। অর্জুনের মুখে পাকা গোঁফ দাড়ি দিয়ে খুব সহজেই ভীষ্ম করে দেওয়া যাবে। আর রথটা হবে সিংহাসন, তার উপর যুধিষ্ঠিরকে বসিয়ে দিও। আর ঐ যে গরুড় আর সাপ, ঐটে একটু বদলিয়ে দিলেই গদা হাতে ভীম হয়ে যাবে। আর শিশুপাল তো আছেই—ঐ গাছটাকে একটু নাক-মুখ ফুটিয়ে দিলেই হবে। তারপর রাজসুয় যজ্ঞের কয়েকটা রাজাকে দেখালেই বাস্!'

"কথাটা কালাচাঁদের পছন্দ হল না, তাই আমি অনেক ভেবেচিন্তে আবার বললাম, 'তাহলে জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ কর না কেন? ঐ রথটা জন্মেজয় আর কৃষ্ণকে জটা-দাড়ি দিয়ে পুরুতঠাকুর বানিয়ে দাও। সুদর্শন চক্রটা হবে ঘিয়ের ভাঁড়। যজ্ঞের আগুনের মধ্যে তিনি ঘি ঢালছেন। ঐ ধোঁয়াগুলো মনে কর যজ্ঞেরই ধোঁয়া! একটা সাপ আছে, আরও কয়েকটা এঁকে দিও। আর অর্জুনকে কর আস্তীক, সে হাত তুলে তক্ষককে বলছে—তিষ্ঠ তিষ্ঠ। আর ঐ

চামচিকেটা, মানে গরুড়টা, ওটাকে মুনি টুনি কিছু একটা বানিয়ে দিও।' পতাকাটাকে কি রকম করতে হবে সেইটা বলতে যাচ্ছি, এমন সময় কালাচাঁদ আমায় ধাক্কা দিয়ে বলর, 'থাক, থাক, আর তোমার বিদ্যে জাহির করে কাজ নেই। দেখি।'

"আমি বললাম, 'তা অত রাগ কর কেন ভাই? আমি তো আর বলছি না যে আমার পরামর্শ মতো তোমাকে চলতে হবে। পছন্দ হয় কর, না হয়তো কোরো না, বাস্। এর মধ্যে আবার রাগারাগি কর কেন? আমার কথামতো না করে অন্য একটা কিছু কর না। মনে কর, ওটাকে সমুদ্র মন্থন করে দিলেও তো হয়। ঐ ধোঁয়াওয়ালা বড় গাছটা মন্দার পর্বত, রথটা ধন্বন্তরী কিম্বা লক্ষ্মী—মন্থন থেকে উঠে এসেছেন। ওদিকে সুদর্শন চক্রটা চাঁদ হতে পারবে, অর্জুনের পিছনে কতগুলো দেবতা এঁকে দাও আর এদিকে কৃষ্ণ আর চামচিকের দিকে কতগুলো অসুর'—কথাটা ভালো করে বলতে না বলতেই কাঁলাচাঁদ আমার কান ধরে মারতে লাগল। আচ্ছা, দেখ দেখি কি অন্যায়! আমি বন্ধুভাবে দুটো পরামর্শ দিতে গেলাম—তা তোমার পছন্দ হয়নি বলেই আমায় মারবে? যা বলেছি সব শুনলে তো, এর মধ্যে এত রাগ করবার কি হল বাপু?"

বাস্তবিক, কালাচাঁদের, এ বড় অন্যায়! সে রাগ করিল কিসের জন্য? নিধিরাম তাহাকে মারে নাই, ধরে নাই, বকে নাই, গাল দেয় নাই, চোখ রাঙায় নাই, মুখ ভ্যাংচায় নাই—তবে রাগ করিবার কারণটা কি?

ব্যাপার কি বোঝা গেল না, তাই সন্ধ্যায় সবাই মিলিয়া কালাচাঁদের, বাড়িতে গেলাম। আমি বলিলাম, "ভাই কালাচাঁদ, আমরা তোমার সেই ছবিটা দেখতে চাই। সেই যে সমুদ্র লঙঘন না কি যেন? "রামপ্রসাদ বলিল, "দ্যুৎ সমুদ্র লজ্ঘন কিসের? অগ্নিপরীক্ষা।" আর একজন কে যেন বলিল, "না, না, কি একটা বধ।" কেন জানি না, কালাচাঁদ হাঁ হাঁ করিয়া একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। "যাও, ইয়ার্কি করতে হবে না," বলিয়া সে তাহার ছবির খাতাখানি ফড়ফড় করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল—আর রাগে গজরাইতে লাগিল। আমরা হতভম্ব হইয়া রহিলাম। সকলেই বলিলাম, কাঁলাচাঁদের

মাথায় বোধহয় একটু পাগলামির ছিট্ আছে। নইলে সে খামকা এত রাগ করবে কেন?”

দুপুরের খাওয়া শেষ হইতেই গোপাল অত্যন্ত ভালোমানুষের মতন মুখ করিয়া দু—একখানা পড়ার বই হাতে লইয়া তিনতলায় চলিল। মামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে গোপলা, এই দুপুর রোদে কোথায় যাচ্ছিস?" গোপাল বলিল, "তিনতলায় পড়তে যাচ্ছি।"

মামা—"পড়বি তো তিনতলায় কেন? এখানে বসে পড় না।"

গোপাল—"এখানে লোকজন যাওয়া-আসা করে, ভোলা গোলমাল করে, পড়বার সুবিধা হয় না।"

মামা—"আচ্ছা, যা মন দিয়ে পড়গে।"

গোপাল চলিয়া গেল। মামাও মনে মনে একটু খুশি হইয়া বলিলেন, 'যাক, ছেলেটার পড়াশুনায় মন আছে।'

এমন সময় ভোলাবাবুর প্রবেশ—বয়স তিন কি চার, সকলের খুব আদুরে। সে আসিয়াই বলিল, "দাদা কই গেল?" মামা বলিলেন, "দাদা এখন তিনতলায় পড়াশুনা করছে, তুমি এইখানে বসে খেলা কর।"

ভোলা তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর বসিয়া প্রশ্ন আরম্ভ করিল, 'দাদা কেন পড়াশুনা করছে? পড়াশুনা করলে কি হয়? কি করে পড়াশুনা করে?' ইত্যাদি। মামার তখন কাগজ পড়িবার ইচ্ছা, তিনি প্রশ্নের চোটে অস্থির হইয়া শেষটায় বলিলেন, "আচ্ছা ভোলাবাবু, তুমি ভোজিয়ার সঙ্গে খেলা কর গিয়ে, বিকেলে তোমার লজেঞ্চুস এনে দেব।" ভোলা চলিয়া গেল।

আধঘন্টা পরে ভোলাবাবুর পুনঃপ্রবেশ। সে আসিয়াই বলিল, "মামা, আমিও পড়াশুনা করব।"

মামা বলিলেন, "বেশ তো আর একটু বড় হও, তোমার রঙচঙে সব পড়ার বই কিনে এনে দেব।"

ভোলা—"না, সে রকম পড়াশুনা নয়, দাদা যে রকম পড়াশুনা করে সেইরকম।"

মামা—"সে আবার কি রে?"

ভোলা—'হাঁ, সেই যে পাতলা-পাতলা রঙিন কাগজ থাকে আর কাঠি থাকে, আর কাগজে আঠা মাখায় আর তার মধ্যে কাঠি লাগায়, সেই রকম।'

দাদার পড়াশুনার বর্ণনা শুনিয়া মামার চক্ষু স্থির হইয়া গেল! আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া তিনতলায় উঠিলেন, চুপি চুপি ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, তাঁর ধনুর্ধর ভাগ্নেটি জানালার সামনে বসিয়া একমনে ঘুড়ি বানাইতেছে। বই দুটি ঠিক দরজার কাছে তক্তাপোশের উপর পড়িয়া আছে। মামা অতি সাবধানে বই দুখানা দখল করিয়া নিচে নামিয়া আসিলেন।

খানিক পরেই গোপালচন্দ্রের ডাক পড়িল। গোপাল আসিতেই মামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর ছুটির আর কদিন বাকি আছে?"

গোপাল বলিল, "আঠারো দিন।"

মামা—"বেশ পড়াশুনা করছিস তো? না, কেবল ফাঁকি দিচ্ছিস?"

গোপাল—"না, এই তো এতক্ষণ পড়ছিলাম।"

মামা—"কি বই পড়ছিলি?"

গোপাল—"সংস্কৃত।"

মামা—"সংস্কৃত পড়তে বুঝি বই লাগে না? আর অনেকগুলো পাতলা কাগজ, আঠা আর কাঠি নিয়ে নানারকম কারিকুরি করার দরকার হয়?"

গোপালের চক্ষু তো স্থির! মামা বলে কি? সে একেবারে হতভম্ব হইয়া হাঁ করিয়া মামার দিকে তাকাইয়া রহিল। মামা বলিলেন, "বই কোথায়?"

গোপাল বলিল, "তিনতলায়।"

মামা বই বাহির করিয়া বলিলেন, "এগুলো কি?" তারপর তাহার কানে ধরিয়া ঘরের এক কোণে বসাইয়া দিলেন। গোপালের ঘুড়ি লাটাই সুতো ইত্যাদি সরঞ্জাম আঠারো দিনের জন্য মামার জিম্মায় বন্ধ রহিল।

'হরিপদ! ও হরিপদ!'

হরিপদের আর সাড়াই নেই! সবাই মিলে এত চেঁচাচ্ছে, হরিপদ আর সাড়াই দেয় না। কেন, হরিপদ কালা নাকি? কানে কম শোনে বুঝি? না, কম শুনবে কেন—বেশ দিব্যি পরিস্কার শুনতে পায়। তবে হরিপদ কি বাড়ি নেই? তা কেন? হরিপদর মুখ ভরা ক্ষীরের লাড়ু, ফেলতেও পারে না, গিলতেও পারে না। কথা বলবে কি করে? আবার ডাক শুনে ছুটে আসতেও পারে না—তাহলে ধরা পড়ে যাবে। তাই সে তাড়াতাড়ি লাড়ু গিলছে আর জল খাচ্ছে, আর যতই গিলতে চাচ্ছে, ততই গলার মধ্যে লাড়ুগুলো আঠার মতো আটকে যাচ্ছে। বিষম খাবার যোগাড় আর কি!

এটা কিন্তু হরিপদর ভারি বদভ্যাস! এর জন্য কত ধমক, কত শাসন, কত শাস্তি, কত সাজাই যে সে পেয়েছে, তবু তার আক্কেল হল না। তবু সে লুকিয়ে চুরিয়ে পেটুকের মতো খাবেই। যেমন হরিপদ, তেমন তার ছোট ভাইটি। এদিকে পেট রোগা, দুদিন অন্তর অসুখ লেগেই আছে, তবু হ্যাংলামি তাদের আর যায় না। যেদিন শাস্তিটা একটু শক্ত রকমের হয়, তারপর কয়েক দিন ধরে প্রতিজ্ঞা থাকে, 'এমন কাজ আর করব না।' যখন অসময়ে অখাদ্য খেয়ে, রাত্রে তার পেট কাড়মায়, তখন কাঁদে আর বলে, 'আর না, এইবারেই শেষ!' কিন্তু দুদিন না যেতেই আবার যেই সেই।

এই তো কিছুদিন আগে পিসিমার ঘরে দই খেতে গিয়ে তারা জব্দ হয়েছিল, কিন্তু তবু তো লজ্জা নেই! হরিপদর ছোট ভাই শ্যামাপদ এসে বলল, "দাদা, শিগগির এস। পিসিমা এই মাত্র এক হাঁড়ি দই নিয়ে তাঁর খাটের তলায় লুকিয়ে রাখলেন।" দাদাকে এত ব্যস্ত হয়ে এ খবরটা দেবার অর্থ এই যে, পিসিমার ঘরে যে শিকল দেওয়া থাকে, শ্যামাপদ সেটা হাতে নাগাল পায় না—তাই দাদার সাহায্য দরকার হয়। দাদা এসে আস্তে আস্তে শিকলটা খুলে আগেই তাড়াতাড়ি গিয়ে খাটের তলায় দইয়ের হাঁড়ি থেকে এক খাবল তুলে নিয়ে খপ করে মুখে দিয়েছে। মুখে দিয়েই চীৎকার! কথায়

বলে 'ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে,' কিন্তু হরিপদর চেঁচানো তার চাইতেও সাংঘাতিক! চীৎকার শুনে মা-মাসি-দিদি-পিসি যে যেখানে ছিলেন, সব 'কি হল' বলে দৌড়ে এলেন। শ্যামাপদ বুদ্ধিমান ছেলে, সে দাদার চীৎকারের নমুনা শুনেই দৌড়ে ঘোষেদের পাড়ায় গিয়ে হাজির! সেখানে অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো তার বন্ধু শান্তি ঘোষের কাছে পড়া বুঝে নিচ্ছে। এদিকে হরিপদর অবস্থা দেখে পিসিমা বুঝেছেন যে হরিপদ দই ভেবে তাঁর চুনের হাঁড়ি চেখে বসেছে! তারপর হরিপদর যা সাজা! এক সপ্তাহ ধরে সে না পারে চিবোতে, না পারে গিলতে, তার খাওয়া নিয়েই এক মহা হাঙ্গামা! কিন্তু তবু তো তার লজ্জা নেই! আজ আবার লুকিয়ে কোথায় লাড্ডু খেতে গিয়েছে। ওদিকে মামা তো ডেকে ডেকে সারা!

খানিক বাদে মুখ ধুয়ে মুছে হরিপদ ভালোমানুষের মতো এসে হাজির। হরিপদর বড়মামা বললেন, "কিরে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি?" হরিপদ বলল, "এইতো, উপরে ছিলাম।" "তবে, আমরা এত চেঁচাচ্ছিলাম, তুই জবাব দিচ্ছিলি না যে?" হরিপদ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, "আজ্ঞে, জল খাচ্ছিলাম কিনা।" "শুধু জল? না, কিছু স্থলও ছিল?" হরিপদ শুনে হাসতে লাগল যেন তার সঙ্গে ভারি একটা রসিকতা করা হয়েছে। এর মধ্যে তার মেজমামা মুখখানা গম্ভীর করে এসে হাজির। তিনি ভিতর থেকে খবর এনেছেন যে, হরিপদ একটু আগেই ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছিল, আর তারপর থেকেই প্রায় দশ-বারোখানা ক্ষীরের লাড্ডু কম পড়েছে। তিনি এসেই হরিপদর বড়মামার সঙ্গে খানিকক্ষণ ইংরাজিতে ফিসফাস কি যেন বলাবলি করলেন, তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, "বাড়িতে ইঁদুরের যে রকম উৎপাত, ইঁদুর মারবার একটা কিছু বন্দোবস্ত না করলে আর চলছে না। চারিদিকে যে রকম প্লেগ আর ব্যারাম! এই পাড়া শুদ্ধ ইঁদুর না মারলে আর রক্ষা নেই।" বড়মামা বললেন, "হ্যাঁ, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দিদিকে বলেছি, সেঁকো বিষ দিয়ে লাড্ডু পাকাতে—সেইগুলো একবার ছড়িয়ে দিলেই ইঁদুরের বংশ নির্বংশ হবে!"

হরিপদ জিগগেস করল, "লাড্ডু কবে পাকানো হবে?" বড়মামা বললেন, "সে এতক্ষণে হয়ে গেছে, সকালেই টেঁপিকে দেখছিলাম একথাল ক্ষীর নিয়ে

দিদির সঙ্গে লাড্ডু, পাকাতে বসেছে।'' হরিপদর মুখখানা আমসির মতো শুকিয়ে এল, সে খানিকটা ঢোঁক গিলে বলল, ''সেঁকো বিষ খেলে কি হয় বড়মামা?'' ''হবে আবার কি? ইঁদুর গুলো মারা পড়ে, এই হয়।'' ''আর যদি মানুষে এই লাড্ডু খেয়ে ফেলে?'' ''তা একটু আধটু যদি খেয়ে ফেলে তো নাও মরতে পারে—গলা জ্বলবে, মাথা ঘুরবে, বমি হবে, হয়তো হাত-পা খিঁচবে। ''আর যদি একেবারে এগারোটা লাড্ডু খেয়ে ফেলে?'' বলে হরিপদ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। তখন বড়মামা হাসি চেপে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, ''বলিস কিরে! তুই খেয়েছিস নাকি?'' হরিপদ কাঁদতে কাঁদতে বলর, ''হ্যাঁ বড়মামা, তার মধ্যে পাঁচটা খুব বড় ছিল। তুমি শিগগির ডাক্তার ডাক বড়মামা, আমার কি রকম গা ঝিম ঝিম আর বমি বমি করছে।''

মেজমামা দৌঁড়ে গিয়ে তার বন্ধু রমেশ ডাক্তারকে পাশের বাড়ি থেকে ডেকে আনলেন। তিনি প্রথমেই খুব একটা কড়া রকমের তেতো ওষুধ হরিপদকে খাইয়ে দিলেন। তারপর তাকে কি একটা শুঁকতে দিলেন, তার এমন ঝাঁঝ যে, বেচারার দুই চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। তারপর তাঁরা সবাই মিলে লেপ কম্বল চাপা দিয়ে তাকে ঘামিয়ে অস্থির করে তুললেন। তারপর একটা ভয়ানক উৎকট ওষুধ খাওয়ানো হল। সে এমন বিস্বাদ আর এমন দুর্গন্ধ যে, খেয়েই হরিপদ ওয়াক্ ওয়াক্ করে বমি করতে লাগল।

তারপর ডাক্তার তার পথ্যের ব্যবস্থা করে গেলেন। তিনদিন সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না, চিরতার জল আর সাগু খেয়ে থাকবে। হরিপদ বলল, ''আমি উপরে মা-র কাছে যাব।'' ডাক্তার বললেন, ''না, যতক্ষণ বাঁচবার আশা আছে ততক্ষণ নাড়াচাড়া করে কাজ নেই। ও আপনাদের এখানেই থাকবে।'' বড়মামা বললেন, ''হ্যাঁ, মা-র কাছে যাবে না আরো কিছু! মাকে এখন ভাবিয়ে তুলে তোমার লাভ কি? তাঁকে এখন খবর দেবার কিছু দরকার নেই।''

তিনদিন পরে যখন সে ছাড়া পেল, তখন হরিপদ আর সেই হরিপদ নেই, সে একেবারে বদলে গেছে। তার বাড়ির লোকে সবাই জানে হরিপদর ভারি

ব্যারাম হয়েছিল, তার মা জানেন যে বেশি পিঠে খেয়েছিল বলে হরিপদর পেটের অসুখ হয়েছিল। হরিপদ জানে সেঁকো বিষ খেয়ে সে আরেকটু হলেই মারা যাচ্ছিল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে কি, তা জানেন কেবল হরিপদর বড়মামা আর মেজমামা, আর জানেন রমেশ ডাক্তার—আর এখন জানলে তোমরা, যারা এই গল্প পড়েছ।

রামবাবু লোকটি যেমন কৃপণ, তাঁর প্রতিবেশী বৃন্দাবনচন্দ্রের আবার তেমনি হাত খোলা। দুজনের বহুকালের বন্ধুতা, অথচ কি চেহারায়, কি স্বভাব-প্রকৃতিতে কোথাও দুজনের মিল নেই। বৃন্দাবন বেঁটেখাটো গোলগাল গোছের মানুষ, তাঁর মাথা ভরা টাক, গোঁফ দাড়ি সব কামানো। ছাপান্ন বছর অতি প্রশংসার সঙ্গে রেজেস্ট্রি অফিসে চাকরি করে শেষদিকে তাঁর খুব পদোন্নতি হয়েছিল। এখন ষাট বছর বয়সে তিনি সবে মাত্র পেনসন নিয়ে বিশ্রাম করছেন। তিনি, তাঁর গিন্নি, আর এক বুড়ো জ্যেঠামশাই, এ ছাড়া ত্রিসংসারে তাঁর আর কেউ নেই। জ্যেঠামশাই বিয়েটিয়ে করেননি, বৃন্দাবনের সঙ্গেই থাকেন।

রামপ্রসাদ সান্যাল লোকটি ছিপছিপে লম্বা। পোস্টমাস্টার প্রাণশঙ্কর ঘোষ ছাড়া তেমন ঢ্যাঙা লোক সে পাড়াতে আর খুঁজে পাবে না। এক অক্ষর ইংরাজি জানেন না, কিন্তু মার্বেল পাথর আর পাটের তেলের ব্যবসা করে তিনি প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি করেছেন, দেশে জমিদারী কিনেছেন আর নানারকম কারখানায় অংশীদার হয়ে বসেছেন। তাঁর আটটি ছেলে, কিন্তু মেয়ে একটিও হল না বলে তাঁর ভারি দুঃখ। প্রকাণ্ড কপাল, তার উপর একরাশ চুল, মুখে লম্বা লম্বা দাড়ি আর চোখে হাল-ফ্যাশানের ফ্রেম-ছাড়া চশমা, কানের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই, কেবল নাকের উপর স্প্রিং দিয়ে এঁটে বসানো। মোট কথা, দেখলেই বোঝা যায় যে মানুষটি কম কেউকেটা নন।

প্রতিদিন সন্ধ্যা হতেই পাড়ার মাতব্বর বাবুরা সবাই রামবাবুর বৈঠকখানা ঘরে এসে জোটেন, আর পান-তামাক-চা-বিস্কুট-সন্দেশ ইত্যাদির সঙ্গে খুব হাসি-তামাশা গল্প-গুজব চলতে থাকে। বৈঠকখানা ঘরটি বেশ বড়, মেঝের উপর প্রকাণ্ড ফরাশ পাতা, তার উপর কতকগুলো মোটাসোটা তাকিয়া আর রঙচঙে হাত-পাখা এদিক ওদিক ছড়ানো। তাছাড়া ঘরের মধ্যে কোথাও চেয়ার টেবিল বা কোনরকম আসবাবপত্র একেবারেই নেই।

পোস্টমাস্টারবাবু, হরিহর ডাক্তার, যতীশ রায় হেডমাস্টার, ইনস্পেক্টার বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি অনেকেই সেখানে প্রতিদিন আসেন। বৃন্দাবন বসু বড়ো লাজুক লোক, প্রথম প্রথম সেদিকে বড় একটা ঘেঁসতেন না। সে-পাড়ায় তিনি সবে নতুন এসেছেন, কারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই, খালি পোস্টমাস্টারবাবুর সঙ্গে একটু জানাশোনা। যা হোক, পোস্টামাস্টারবাবু নাছোড়বান্দা লোক, তিনি বড়দিনের ছুটির মধ্যে এক রবিবার একরকম জোর করেই তাঁকে রামবাবুর বাড়ি নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। প্রথম দিনের পরিচয়েই দুজনের আলাপ এমন জমে উঠল যে তারপর থেকে রামবাবুর বৈঠকে যাবার জন্য বৃন্দাবনচন্দ্রকে আর কোনো তাগিদ দেওয়ার দরকার হত না।

এই ঘটনার সাতদিন পরে একদিন রামবাবুর বৈঠক খুব জমেছে। মানুষকে চিনতে না পারার দরুন কত সময়ে কত অদ্ভূত ভুল হয়, তাই নিয়ে বেশ কথাবার্তা চলছে। হরিহরবাবু বললেন, "আমি একবার যা ফ্যাসাদে পড়েছিলাম, সে বোধহয় আপনাদের বলিনি। সে প্রায় বিশ বছরের কথা। একদিন সন্ধ্যার সময় খাওয়া দাওয়া সেরে একটু শিগগির শিগগির ঘুমব ভাবছি, এমন সময়ে আমার ডিসপেনসারির চাকরটা এসে খবর দিল, প্রমথবাবু এসেছেন। প্রমথ মিত্তির তখন তার মাথার ব্যারামের জন্য আমাকে দিয়ে চিকিৎসা করাত। সেদিন কথা ছিল আমি তার জন্য একটা মিক্সচার তৈরি করিয়ে রাখব, সে সন্ধ্যার সময় সেটা নিয়ে যাবে। তাই চাকর এসে খবর দিতেই আমি ওষুধের শিশিটা তার হাতে দিয়ে সেই সঙ্গে একটা কাগজে লিখে দিলাম, ওষুধটা এখুনি একদাগ খাবেন। দুর্বল মস্তিষ্কের পক্ষে কোনোরকম মানসিক পরিশ্রম বা উত্তেজনা ভালো নয়, এ কথা সর্বদা মনে রাখবেন। তাহলেই আপনার মাথার ব্যারাম শিগগির সারবে। মিনিট খানেক যেতে না যেতেই চাকরটা ঘুরে এসে খবর দিল যে বাবুটি চিঠিটি পড়ে বেজায় খাপ্পা হয়েছেন এবং দাওয়াইয়ের শিশিটি ভেঙে আমায় গাল দিতে দিতে প্রস্থান করেছেন। শুনে তো আমার চক্ষুস্থির! যা হোক, ব্যাপারটা পরিস্কার হতে বেশি দেরি হল না। একটু সন্ধান করতেই বোঝা গেল যে, লোকটি মোটেই প্রমথ মিত্তির নন, আমারই মামাশ্বশুর বাঁশবেড়ের প্রমথ নন্দী। যেরকম বদমেজাজী লোক, সে রাত্রেই আমায় ছুটতে হল বুড়োর তোয়াজ করবার জন্য। বুড়ো কি সহজে ঠাণ্ডা হয়! তাঁকে অপমান করা, বা তাঁর সঙ্গে ইয়ার্কি

করা যে আমার মোটেই অভিপ্রায় ছিল না এবং ওষুধটা কিম্বা চিঠিটা যে তাঁর জন্য দেওয়া হয়নি, এই সহজ কথাটি তাঁর মাথায় ঢোকাতে প্রায় দুটি ঘন্টা সময় লেগেছিল। এদিকে বাসায় ফিরে শুনি প্রমথ মিত্তির এসে তার ওষুধ তৈরি না পেয়ে খুব বিরক্ত হয়ে চলে গেছে। পরদিন সকালে আবার তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করি।"

এই গল্প শুনে ইনস্পেক্টারবাবু বললেন, "আপনার তো, মশাই, অল্পের উপর দিয়ে গেল, আমার ঐ রকম একটা ভুলের দরুন চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়েছিল। সেও বহুদিনের কথা, তখন আমি সবেমাত্র পুলিশের চাকরি নিয়েছি। ঘোষপুরের বাজার নিয়ে সে সময়ে সুদাস মণ্ডলের সঙ্গে রায়বাবুদের খুব ঝগড়া চলছে। একদিন খবর পাওয়া গেল, আজ সন্ধ্যার পর সুদাস লাঠিয়াল নিয়ে বাজার দখল করতে আসবে। ইনস্পেক্টার যোগীনবাবুর হুকুমে আমি ছয়জন কনস্টেবল নিয়ে সন্ধ্যার কাছাকাছি ঘোষপুরে উপস্থিত হলাম। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না; সন্ধ্যার একটু পরেই দেখলাম নদীর দিক থেকে কিসের আলো আসছে। মনে হচ্ছে কারা যেন কাঁঠালতলায় বসে বিশ্রাম করছে। ব্যাপার কি দেখবার জন্য আমি খুব সাবধানে একটা ঝোপের আড়াল পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি একটা মশালের ঝাপসা আলোয় লাঠি হাতে কয়েকটা লোক বসে আছে, আর এক পালকির আড়ালে দুজন লোক কথাবার্তা বলছে। কান পেতে শুনলাম একজন বলর, 'সুদাসদা, কতদূর এলাম?' উত্তর হল, 'এই তো ঘোষপুরের বাজার দেখা যাচ্ছে।' অম্নি আর কথা নেই। আমি জোরে শিস্ দিতেই সঙ্গের পুলিশগুলো মার-মার করে তেড়ে এসেছে। পুলিশের সাড়া পাবামাত্র সুদাসের লোকগুলো 'বাপরে মারে' করে কে যে কোথায় সরে পড়ল, তা আর ধরতেই পারা গেল না। কিন্তু পালকির কাছে যে দুটো লোক ছিল, তারা খুব সহজেই ধরা পড়ে গেল। তাদের একজনের বয়েস অল্প, চেহারাটা গোঁয়ারগোবিন্দ গোছের—বুঝলাম এই সুদাস মণ্ডল। সে আমায় তেড়ে কি যেন বলতে উঠেছিল, আমি এক ধমক লাগিয়ে বললাম, 'হাতে হাতে ধরা পড়েছ বাপু, এখন রোখ করে লাভ নেই, কিছু বলবার থাকে তো থানায় গিয়ে বলো'। শুনে তার সঙ্গের বুড়ো লোকটা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে খানিকক্ষণ অনর্গল কি যে বকে গেল তার কিছুই বুঝতে পারলাম না, খালি বুঝলাম যে সে আমাকে তার 'সুদাসদা'র পরিচয়

বোঝাচ্ছে। আমি বললাম, ‘অত পরিচয় শুনবার আমার দরকার নেই, আসল পরিচয়টা আজ ভালোরকমই পেয়েছি।’ তারপর তাদের হাতকড়া পরিয়ে তো মহা ফুর্তিতে থানায় এনে হাজির করা গেল। তারপর মশাই যা কাণ্ড! হেড ইনস্পেক্টার যতীনবাবু রাগে আগুনের মতো লাল হয়ে, টেবিল থাবড়িয়ে, দোয়াত উলটিয়ে, কাগজ কলম ছুঁড়ে আমায় খুব সহজেই বুঝিয়ে দিলেন যে আমি একটি আস্ত রকমের হস্তীমূর্খ ও অর্বাচীন পাঁঠা। যে লোকটিকে ধরে এনেছি সে মোটেই সুদাস মণ্ডল নয়, তার নাম সুবাসচন্দ্র বোস; সে যতীনবাবুর জামাই, সঙ্গের লোকটি তার ঠাকুরদার আমলের চাকর; যতীনবাবুর কাছেই তারা আসছিল। আমার বুদ্ধিটা হাঁ-করা বোয়াল মাছের মতো না হলে, আমি সুবাস শুনতে কখনই সুদাস শুনতাম না—ইত্যাদি। অনেক কষ্টে অনেক খোশামুদি করে, অনেক হাতে পায়ে ধরে, সে যাত্রায় চাকরিটা বজায় রাখতে হয়েছিল।”

ইনস্পেক্টারের গল্প শেষ হতেই বৃন্দাবনচন্দ্র টিকি দুলিয়ে বললেন, “আপনাদের গল্প শুনে আমারও একটা গল্প মনে পড়ে গেল। সেও ঐরকম ‘উদোর-বোঝা-বুদোর-ঘাড়ে’ গোছের গল্প। তবে ভুলটা আমি নিজে করিনি, করেছিল আমার ভাইপো-সেই যে ছোকরাটি এখন মেডিকেল কলেজে পড়ে। একদিন সন্ধ্যার সময় ঘরের মধ্যে বসে আছি। ঘরেও বাতি জ্বালা হয়নি, বাইরেও বেশ অন্ধকার, খালি নখের মতো একটু খানি চাঁদ সবেমাত্র পুবদিকে উঁকি দিয়েছে; এমন সময় মনে হল যেন একটা মানুষ দেয়াল বেয়ে বেয়ে বাড়ির ছাদের উপর উঠছে—”

বৃন্দাবনবাবু সবে এইটুকু বলেছেন, এমন সময় বারান্দায় কে ডাক দিল, “বাবু, টেলিগ্রাম।” রামবাবু তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে টেলিগ্রামখানা নিয়ে আসলেন, তারপর চোখের চশমাটি কপালে তুলে টেলিগ্রামখানা খুলে পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর চোখ ক্রমেই গোল হয়ে উঠছে দেখে ডাক্তারবাবু জিগগ্যেস করলেন, “কি ব্যাপারখানা কি?” রামবাবু ধপাস্ করে সোফার উপর বসে পড়ে বললেন, “এই দেখুন না, দেশ থেকে পরেশ টেলিগ্রাম করছে—সিরিয়াস্ একসিডেন্ট কাম্ ইমেডিয়েটলি (অর্থাৎ গুরুতর দুর্ঘটনা, শীঘ্র আসুন)।” রামবাবুর তিন ছেলে কয়দিন হল পুজোর ছুটিতে

দেশে গিয়েছে, আর একটি মামাবাড়িতে আছে, আর বাকি তিনটে মায়ের কাছে বাড়িতেই রয়েছে। রামবাবু বললেন, "এত লোক থাকতে পরেশ ছোকরাটাকে দিয়েই বা টেলিগ্রাম করাতে গেল কেন? দুটো পয়সা খরচ করে বড়রা কেউ একটু ভালো করে গুছিয়ে টেলিগ্রাম করলেই পারত। এখন কি যে করি? আজ বিষ্যুৎবার, এ সময়ে রওয়ানাই বা হই কেমন করে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।" তিনি চাকরকে ডেকে তিনতলার বড় ঘর থেকে তাঁর কলমটা আনতে বললেন, আর বললেন, "একটা টেলিগ্রাম করে দেখা যাক কি জবাব আসে।" এই বলে তিনি আবার টেলিগ্রামখানা পড়তে লাগলেন।

গল্পগুজব তো চুলোয় গেল, সবাই মিলে ভাবতে বসল এখন কি করা যায়। এমন সময় রামবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, "ও কি! এ কার টেলিগ্রাম? এ তো দেখছি 'রমাপদ সেন' লেখা। আমার কি যে চোখ হয়েছে, আমি পড়ছি রামপ্রসাদ সান্যাল।" বলতেই পোস্টামাস্টার প্রিয়শঙ্করবাবু বলে উঠলেন, "ও! রমাপদ যে ও-পাড়ার গুপীবাবুর ভাই; আমি জানি তার শ্বশুরের নাম পরেশনাথ কি যেন।" তখন খুব একটা হাসির ধুম পড়ে গেল।

রামবাবু বললেন, "দেখলেন মশাই, পিয়ন ব্যাটার কাণ্ড! ভুল টেলিগ্রাম দিয়ে আমায় মেরেছিল আর কি! একে বুড়ো বয়েস, তাতে আবার জানেন তো আমার হার্টের ব্যারাম আছে।" হেডমাস্টার যতীশবাবু, হেসে বললেন, "আপনি আবার এর মধ্যেই বুড়ো হলেন কি করে?" রামবাবু বললেন, "বিলক্ষণ! এ পাড়ায় আমার মতন বুড়ো আর ক'টি পান দেখুন তো! এই আষাঢ় মাসে আমি ষাটের কোঠায় পা দিয়েছি।" বৃন্দাবনবাবু বললেন, "তাহলে আমার জ্যেঠামশায়ের কাছে আপনার হার মানতে হল। তাঁর উনসত্তর।" ডাক্তারবাবু বললেন, "আমারও বড় কম হয়নি, চৌষট্টি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ পাড়ায় বয়েসের জন্য যদি প্রাইজ দিতে হয়, তাহলে ভোলানাথের বাপকেই দেওয়া উচিত; তার নাকি এখন আটাত্তর বছর চলেছে।" এই রকম বাজে কথা চলছে, এমন সময়ে বড় বড় বারকোশের উপর থালা সাজিয়ে রামবাবুর তিনটে চাকর খাবার নিয়ে হাজির। কটুরি, নিমকি, সন্দেশ থেকে পিঠে পায়েস পর্যন্ত প্রায় বারো-চৌদ্দ রকমের খাবার। ডাক্তার বললেন, "বাপরে! এ যে বিরাট আয়োজন। ব্যাপারখানা কি?"

রামবাবু বললেন, "ঐ যা! আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি। আজ আমার জামাই এসেছেন, তাই বাড়িতে একটু মিষ্টি মুখের আয়োজন করা হয়েছে।" ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "এত বড় গুরুতর কথাটাই বলতে ভুলে গেলেন? আপনার বয়েসটা নিতান্তই বেড়ে গেছে দেখছি।" বৃন্দাবন বললেন, "তা হোক, আজকের বৈঠকে অনেক রকমই ভুলের কাণ্ড শুনলাম আর দেখলাম, কিন্তু এ ভুলটি বেশিদূর গড়ায়নি। আসুন, এখন ভুলটা সংশোধন করে নেওয়া যাক।"

(১) গোড়াতেই রামবাবুকে কৃপণ বলা হইয়াছে, কিন্তু গল্পে তাঁহার স্বভাবের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা মোটেই কৃপণের মতো নয়।

(২) বলা হইয়াছে রামবাবু ও বৃন্দাবনবাবুর মধ্যে বহুকালের বন্ধুতা, অথচ পরেই বলা হইয়াছে কারো সঙ্গে বৃন্দাবনবাবুর আলাপ পরিচয় নাই।

(৩) প্রথমেই বৃন্দাবনবাবুর মাথা-ভরা টাক বলা হইয়াছে, অথচ তিনি টিকি দুলাইতেছেন।

(৪) প্রথমে বলা হইয়াছে তাঁহার বয়স ৬০, কিন্তু তিনি চাকরি করিয়াছেন ৫৬ বছর।

(৫) বলা হইয়াছে যে গিন্নী আর জ্যেঠামহাশয় ছাড়া তাঁহার আর কেহ নাই, কিন্তু পরে তাঁহার এক ভাইপোকে হাজির করা হইয়াছে।

(৬) প্রথমে পোস্টমাস্টারের নাম বলা হইয়াছে প্রাণসঙ্কর, পরে লেকা হইয়াছে প্রিয়সঙ্কর।

(৭) রামবাবু ইংরাজি জানেন না, অথচ তিনি চটপট ইংরাজি টেলিগ্রাম পড়িতেছেন।

(৮) রামবাবু পাটের তেলের ব্যবসা করেন, কিন্তু এরকম কোন তেল বা ব্যবসার কথা শোনা যায় না।

(৯) ঐ লাইনে তাঁহার বাড়ি দোতলা হইয়াছে, কিন্তু চাকর গেল তিনতলায়।

(১০) রামবাবুর আটটি ছেলে, কিন্তু মাত্র সাতটির হিসাব পাওয়া যাইতেছে।

(১১) রামবাবুর মেয়ে নাই, কিন্তু তাঁহার এক জামাই আসিয়া হাজির।

(১২) তাঁহার চশমার যে বর্ণনা হইয়াছে, সেইরূপ চশমা কপালে তোলা যায় না।

(১৩) প্রথমে বলা হইয়াছে ঘরে কোনোরকম আসবাবপত্র নাই, কিন্তু পরে সোফার উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১৪) বলা হইয়াছে, ‘বড়দিনের ছুটির মধ্যে এক রবিবার’ বৃন্দাবন রামবাবুর সঙ্গে দেখা করিলেন; গল্পের ঘটনা তাহার ‘সাত দিনের পরে’ সুতরাং সেদিন বৃহস্পতিবার হইতেই পারে না।

(১৫) বড়দিনের সপ্তাহখানেকের মধ্যেই পূজার ছুটি অসম্ভব।

(১৬) বৃন্দাবনবাবুর বয়স মোটে ৬৯ হইতেই পারে না।

(১৭) চাঁদকে যখন আমরা সূর্যের কাছাকাছি দেখি তখনই তাহার চেহারা থাকে ‘সরু নখের মতো।’ সন্ধ্যার সময় পূবদিকে, অর্থাৎ সূর্যের উল্টা দিকে তাহার ওরকম চেহারা অসম্ভব।